লাল দুম্বা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি, এল,

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য দেড় টাকা
শ্রাবণ ১৩৪৩

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ…আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম-পালা

লাল ডুম্বা

—সংস্কার—

সুলভ-সংস্করণ মনু-সংহিতা, বিষ্ণু-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের সনাতন আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি ক'রে নিশিকান্ত নিম্নলিখিত রূপ ধ্রুব-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল :—সৃষ্টির প্রাক্কালেই মানুষের সমাজে শ্রম-বিভাগ রীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে ; আর সেই সময়েই পরের ধন না-ব'লে বা মিথ্যা-ব'লে নিজস্ব করার শ্রম একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান পেয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, বৃত্তি-উপবৃত্তির নির্ঘণ্টে ! বটতলার রামায়ণ-মহাভারত এবং বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়-ভাগও তার মনের মধ্যে ঐ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করেছিল।

অবশ্য এ-সব ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় সে রত হয়েছিল পূর্ণ-যৌবনে। শৈশবে ও কৈশোরে এ-জ্ঞান দুর্ল্লভ সংস্কার-রূপে প্রবুদ্ধ হতো তার মনের আকাশে। তার ফলে বিদ্যালয়ে নিশিকান্তর সহপাঠীরা শ্লেট-পেন্সিল, জলছবি থেকে আরম্ভ ক'রে পাঠ্য-পুস্তক—এমন কি, মাসিক বেতনের টাকা অবধি হারাতে আরম্ভ ক'রেছিল। নিশিকান্তর দেহ ছিল সুঠাম, গলার স্বর মিষ্ট, হাসি মন-ভুলানো ; সুতরাং 'কোনদিন কারও মনের

লাল ছুম্বা

ত্রিসীমায় এমন সন্দেহ উঁকি মারতে পারেনি যে, নিশিকান্তর হাত-টান আছে! যে-সব পদার্থ তার কস্মিন্‌কালে বিদ্যমান ছিল না, সেগুলারও হারানো সংবাদ মাঝে মাঝে ছাত্রমহলে প্রচার হতো! তখন জন-প্রিয় নিশিকান্তর হারানিধির উদ্দেশ্যে শত হৃদয়-উৎস থেকে শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হতো। কিন্তু তার অব্যবহিত পরক্ষণেই শোকার্ত্তদের বিবিধ বস্তুর সন্ধান মিলতো না।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে দারুণ শোকে নিশিকান্ত অঙ্কের মাষ্টারের বীজগণিত আর পাটীগণিত ধার ক'রে কলেজ ষ্ট্রীটের এয়াঙ্গিন শেখের পুরাতন পুস্তকালয়ে বিক্রয় ক'রেছিল। সেই অর্থে 'জনা', 'আলিবাবা' আর 'প্রফুল্ল'র অভিনয় দেখে তবে তার তাপিত প্রাণ শীতল হয়েছিল।

দিনের পর দিন সে যেমন শশিকলার মত দেহায়তনে বৰ্দ্ধিত হচ্ছিল, আইন-ভাঙ্গা-নীতির ঐকান্তিকতা তার মনোরাজ্যের সিংহাসনে ঠিক তেমনি বেগে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল।

পঁচিশ বছর বয়সে চুরি, জুয়াচুরি প্রভৃতি চারুশিল্পে ব্যুৎপন্ন হয়ে গুরগন খাঁ পেশোয়ারির সঙ্গে দশ-আনা ছ-আনা বখরায় নিশিকান্ত আফিম-কোকেনের ব্যবসা ফাঁদে। কু-লোকে বল্‌তো, "মহা-স্বদেশী প্রদর্শনী"তে ঝন্টু বক্‌সের বে-নামীতে তার একটা জুয়ার ষ্টলও ছিল। কিন্তু ইতিহাসে সে কথার উল্লেখ পাওয়া যায়-না। মাঝে একবার নিশিকান্ত "দেশ-মাতৃকা গুণ-চট্" লিমিটেডের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অনেক ভদ্র-সংসারে যাতায়াত করেছিল। সে সময় তার সংযম ছিল অমানুষিক। দুটা মাত্র রূপার সিগারেট-কেস্ ভিন্ন কোনও পরদ্রব্য প্রবেশ-লাভ করেনি তার

পকেটে সেই ছয় মাসে—যে সময় সে দেশীয় শিল্প প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিল।

অপরাধ সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের অভিমত, অপরাধীরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাদের জাতি-বিভাগে ছুত-অছুৎ আছে! যে নোট জাল করে, সে ভাবে, ছিঁচকে চোর অস্পৃশ্য! প্রাচীর-টপকানো সিঁধেল চোরকে ভাবে—বেটা নীচ! টপ্‌কা-ওয়লাকে পকেটমার জানে—ধোঁকাবাজ! অপরাধীর সেরা কোম্পানী-প্রমোটার, ব্যাঙ্ক-মারা প্রভৃতি মহাশিল্পী জুয়াচুরী-গদীকে ব্যাঙের ছাতা বোগাস-ফার্ম ব'লে হেয়-জ্ঞান করে! নিশিকান্তর কিন্তু অপরাধের প্রতি অনুরাগ বিশ্ব-জনীন। ডিগ্‌নিটি অফ লেবার সে মান্‌তো, কাজেই শ্রমের সম্ভ্রম সে প্রত্যক্ষ করতো সকল রকমের হাত-সাফাই, মাথা-খেলানো অপরাধের "কাজে"। একবার সে অপরাধ-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে "অপরাধ বিশ্ব-ভারতীর" এক প্রস্তাব নিয়ে অনেক সর্দ্দারের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু তাদের একচেটে ব্যবসার মাঝে বাহিরের বাজে লোককে স্থান দিতে তারা সম্মত হয় নি। তাই সমাজ একদল দক্ষ-শিল্পীর হাতে লুণ্ঠিত ও বঞ্চিত হবার সুযোগ হারিয়েছিল!

—ফৌজদারী উকীল—

মৃগাঙ্ক মিত্র ফৌজদারী কোর্টের উদীয়মান উকীল। ব্যবহার-বৃত্তি-বৃক্ষের মগ-ডালে না উঠলেও মৃগাঙ্ক বাজীমাতের নিশানা-দেখা ঘোড়ার

মত খুব জোর-কদমে ব্যবসা চালিয়েছিল। তার মন্দ-ভাগ্য, সমকালের উকীলরা তাকে হিংসা করতো বিলক্ষণ। সেটা উদার-বৃত্তি কি না, তাই পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দা খুব উদারভাবে উকীল-খানায় রাজত্ব করে। একদল উকীল বল্‌তো, মৃগাঙ্কর বাগ্মিতা সরকারের পক্ষে ব্যয়সাধ্য। কারণ, তার চাপড়ে টেবিল ফাট্‌তো, গলার জোরে দেওয়াল থেকে বালি খশ্‌তো। মৃগাঙ্কের দেড়-আলমারী পুরাতন-সংস্করণ আইনের কেতাব ছিল। কিন্তু ভাবের মৌলিকতা আর সহজ বুদ্ধির উৎস পাছে রুদ্ধ হয়, এই ভয়ে সেগুলা সে স্পর্শ করতো না। যদি কোনও দিন সে কিম্বা অন্য কোনও উকীল হাকিমদের সামনে আইনের পুস্তক দেখাতো, তা হলে হাকিমরা হেসে বল্‌তো—আজ্ঞে ও আইনটা খুব উত্তমরূপেই আমার জানা আছে।

কাজেই আইনের পুস্তকে বাজে অর্থব্যয় না ক'রে মৃগাঙ্ক উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা স্ত্রীকে গহনা উপহার দিত। আইন না দেখানোর জন্য হাকিমরা তার উপর থাক্‌তো তুষ্ট এবং অলঙ্কার লাভ ক'রে স্ত্রীজাতির সনাতন-রীতি-অনুসারে গৃহ-লক্ষ্মী থাক্‌তো অনুরাগিনী। পুলিশ-কোর্ট থেকে মৃগাঙ্ক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেই এক-মুখ হেসে ভার্য্যা অনুরোধময়ী জিজ্ঞাসা করতো—পান চাই? না, তামাক চাই?

বাগ-ও-বাহারের নায়ক বাদশাহ্‌ আজাদ বক্‌সের মত মৃগাঙ্কর সুখের সংসারে বার্দ্ধক্যের প্রদীপ—পুত্র-কন্যা ছিল না। সর্ব্বমঙ্গলা, ষষ্ঠীতলা, মাণিকপীর কেহই মৃগাঙ্কর সে অভাব পূর্ণ করতে পারে নি।

রথ-যাত্রার ঠিক পূর্ব্বদিনের কথা। আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা—টিপ টিপ ক'রে কখনও বৃষ্টি পড়ছে—কখনও বা ইলসে-গুঁড়ি।

লাল দুম্বা

বেলা তখন সাড়ে নয়টা। উকীল মৃগাঙ্ক মিত্র মাথায় ঢালছিল জল, মুখে বলছিল ঠাকুরকে ভাত বাড়তে—কিন্তু মন ছিল একটা জটিল ধোঁকাবাজির কেসে। সেদিন সওয়াল-জবাব। মৃগাঙ্ক মনে মনে বক্তৃতার ধরতাই আর শেষের ঝঙ্কারের কথাগুলা গুছিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ সংবাদ এলো, অতি-প্রয়োজনীয় কাজে এক মক্কেল তাব সাক্ষাৎ-প্রয়াসী।

পুলিস-কোর্টের উকীলের জীবনে এ ঘটনা নিত্য ঘটে। কলেরা-কেসের ডাক্তারের মত ফৌজদারী-কেসের উকীলের ভাগ্যে জোটে বেশীর ভাগ জরুরী কেস। তারকেশ্বরের গামছায় মাথা মুছতে মুছতে মৃগাঙ্ক আবার কর্ম্মকক্ষে প্রবেশ করলে। দিব্য নধর-কান্তি এক মক্কেল। চোখে সোনার চশমা, পাতলা গালপাট্টা দাড়ি, পাতলা গোঁফ! গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী, পায়ে "শ্রীচরণ-শোভন-পাদুকাগারের" হাল-ফ্যাশনের চটি। ওকালতী-সিনেমায় উত্তম ভূমিকা অভিনয় করে তারা—যারা কাজে তাচ্ছিল্য দেখায়! অর্থোপার্জ্জনটা যেন অযাচিত ঘাড়ে-পড়া ভূত—এই রকম ভাব দেখায়! লোভকে মনের নিভৃত নিলয়ে লুকিয়ে রেখে সদ্য-কুইনাইন-খাওয়া মুখ-ভঙ্গিমায় মৃগাঙ্ক বললে—আঃ, বড় অসময়ে এসেছেন! এখন আমি নূতন কাজ নিতে পারবো না।

যুবক অতি কাতরভাবে বললে—আজ্ঞে অসময়—তা বুঝেছি। কিন্তু আপনি না রক্ষা করলে আমার উপায় নাই। বড় বিপন্ন হয়েই এসেছি। একবার বড়বাজার থানায় যেতে হবে।

—থানায় যেতে হবে? কি বলেন আপনি? এ সময় হবে না।

মিষ্ট-কণ্ঠ মক্কেল অনেক কাকুতি-মিনতি করলে। এক সঙ্গে সাড়ে দশটার সময় মৃগাঙ্কর পাঁচজন হাকিমের কোর্টে নয়টা কেসের ফর্দ্দ শুনেও

মক্কেলের কাতরতা নিরুৎসাহ হলো না। তার নির্দোষ ভাইকে পুলিস বিনা-অপরাধে গেরেফতার করেছে এক প্রবঞ্চকের মিথ্যা অভিযোগে! তাদের বংশে এরকম দুর্ঘটনা অশোক রাজার আমল থেকে কখনও ঘটেনি—তার পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের ইতিহাস তার অবিদিত! সভ্য দেশের পুলিস বিনা-দোষে মানুষের এমন নিগ্রহ করতে পারে, এ সন্দেহ পূর্ব্বে তার মনের চৌকাট পার হয়নি—যদিও সে প্রত্যহ প্রভাতে অমৃতবাজার ও দৈনিক বসুমতী পড়ে।

অবশ্য ৫০৲ টাকা এমন বেশী কিছু নয়। সে আপাততঃ নগদ ২০৲ টাকা মৃগাঙ্ক বাবুর হাতে দিল। বিপদ বন্ধু-বান্ধবকে চিরদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। তা না হ'লে তার মরিশ কাউলে পথে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে কেন? সে ছুটে ট্যাক্সি ডাকতে গেল।

মক্কেল অপর কেহ নয়—নিশিকান্ত। কালবৈশাখীর ঝড়ের মত এসে এক পশলা শীতল জল ঢেলে বিজলীর মত ছুটলো সে গাড়ী ডাকতে।

এই অপ্রত্যাশিত পঞ্চাশ টাকার মিষ্ট-নিক্কণের তালে মৃগাঙ্ক গুন্ গুন্ স্বরে গাইছিল—তায় রে নায় রে নায় রে না! স্ত্রী অনুরোধময়ী চাঁপার কলির মত আঙুলে তার গলায় সাদা-কালো রঙের টাই বেঁধে দিচ্ছিল। সে একবার বাহিরে একাধিক লোক আসার শব্দ পেলে। তারপর নিশিকান্তর মন্দ্রস্বরও শুনলে—মামাবাবু!

সত্যই বেচারা সপরিবারে বিপন্ন। তা না হলে সে তার মাতুলকে সঙ্গে ক'রে আনবে কেন?

উকীল অনুরোধময়ীকে বললে—হাত চালিয়ে নাও।

পরমহংস দেবের ছবির উদ্দেশে প্রণাম ক'রে তেত্রিশ কোটি-দেবতার

লাল ডুম্বা

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে সুপারি-লবঙ্গ-ছোট-এলাচ-মেশানো মশলা মুখে দিয়ে নেমে এসে মৃগাঙ্ক দেখলে, তার কর্ম্ম-কক্ষে এক অচেনা আগন্তুক। অপরিচিত ব্যক্তি সশ্রদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে উকীল বাবুকে নমস্কার করলে। তিনি বললেন—কি বাপু ?

—আজ্ঞে, আমি স্বর্ণকার।

মৃগাঙ্ক মনে মনে ভেঁজে নিলে—স্বর্ণকার ! বিশ্বাসঘাতকতার মামলা —এগুলা অনেক দিন চলে।

প্রকাশ্যে বললে—স্বর্ণকার ! বেশ, ভালো ! কি প্রয়োজন ?

—আজ্ঞে, অলঙ্কারগুলো পচ্ছন্দ হয়েছে কি ?

—অলঙ্কারগুলো ! কিসের অলঙ্কার ?

—আজ্ঞে, বিবাহের অলঙ্কার। আপনার কন্যার বিবাহের জন্য—

লোকটা পাগল না কি ? যাত্রা ক'বে কর্ম্মস্থলে যাবার সময় এ কি জঞ্জাল !

—কন্যার বিবাহ ! জ্বর-বিকারের ধমকে ভুল বকছ না কি ?

—আজ্ঞে, এই যে আপনার ভাগ্নে বাবু গহনা নিয়ে এলেন— মশায়ের কন্যার বিবাহের জন্য !

কি সর্ব্বনাশ ! মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা ! বন্ধ্যা ভার্য্যার কন্যার বিবাহ ! ভগ্নীহীনের ভাগিনেয় ! মোটে মা রাঁধেন না, বাসী আর পান্তা ! কিন্তু তার পুলিস কোর্টের অভিজ্ঞতার ফলে মৃগাঙ্ক বুঝলো, ব্যাপারটা সহজ নয়।

অনেকক্ষণ জেরা-করার পর রহস্যের মর্ম্মভেদ হলো। গোপাল স্বর্ণকারের দোকান তার পাড়ায়। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এক গৌরবর্ণ যুবক

গিয়ে তাকে সমাচার দেয় যে, হঠাৎ মৃগাঙ্কর কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছে! পাত্র বিদেশী। ফরমাশ দিয়ে অলঙ্কার-নির্ম্মাণের সময় নাই। সে গোপালকে অনুরোধ করলে, তার দোকানের তাবৎ তৈয়ারী অলঙ্কার উকীল মশায়কে বিক্রয় করতে। অপর এক গ্রাহকের তাগা, বালা আর কণ্ঠহার তৈরী ছিল। উকীলের যুবক ভাগিনেয়র আগ্রহাতিশয্যে সে সেই গহনাগুলা উকীলের মনস্তুষ্টির জন্য নিয়ে এসেছিল। এক পল্লীতে বাস, বিপদ-আপদও আছে। একজন নামজাদা উকীলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার এমন সুযোগ সে ছাড়বেই বা কেন?

তাকে মৃগাঙ্কর কর্ম্ম-কক্ষে বসিয়ে নিশিকান্ত গহনাগুলা মামীমাকে দেখাবার জন্য নিয়ে গেল। অন্দর-মহলের দরজার কাছে গোপাল তাকে দেখেছিল,—'মামাবাবু' ব'লে ডেকেছিল, তাও গোপাল শুনেছিল। সে জানে, ভাগ্নে-বাবা অন্দর-মহলে প্রবেশ করেছে!

উকীল স্পষ্ট বুঝলো, প্রবঞ্চক বাড়ীর বাহিরে চলে গেছে।

উকীল তাকে বোঝায়, সে বোঝে না। সে বলে—আহা, কি দিব্য চেহারা আপনার ভাগ্নে-বাবার! কি মিষ্ট বচন!

উকীল বলে—ভালো রে ভালো, আমার বাবার কন্যাই জন্মেনি তো ভাগ্নে-বাবা অবতীর্ণ হবে কোন্ গগন থেকে?

গণ্ডগোল, হাসি, কান্না, বকাবকিতে উকীলের আর কোর্টে যাওয়া হলো না। থানায় নিয়ে গিয়ে মৃগাঙ্ক গোপালের এজাহার লেখালে।

অ-করুণ দারোগা বল্লে—লোকটার রসবোধ আছে। এই সেকরা বেটারাই আমাদের জীবনের কাল। যত চোরাই মাল এরাই গালায়।

বেচারা গোপাল শিরে করাঘাত করতে লাগলো। তার সাতপুরুষে

কেউ কোন দিন চোরাই মাল "সামাল" দেয়নি। খরিদ্দারকে না মাল দিলে তাকে নিজেকেই জেলে যেতে হবে! কিন্তু তার কাতরোক্তি কে শোনে?

নিশিকান্ত হাসি-মুখে তার এক বন্ধুর কাছে এক ঢিলে উকীল আর পোদ্দার মারার গল্প বলছিল।

সন্ধ্যার পর টেকচাঁদ ঢেঁকিচাঁদ বেনারসী কাপড়ওয়ালা এসে উকীলকে একখানা জাঁকড়ের রসিদ দেখিয়ে বললে,—আজ্ঞে, কাপড় পছন্দ হয়েছে?

সেই এক গল্প! নিশিকান্ত তার মামাতো বোনের বিবাহের জন্য বেনারসী কাপড় নিয়েছে জাঁকড়ে মামীমার পছন্দের জন্য। নামজাদা উকীল! তার সুন্দর ভাগ্নের হাতেই সে তিনখানা কাপড় মায় ব্লাউজ-পিস্ তখনি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মৃগাঙ্কর পাগল হবার জো! এ ভাগনেও গৌরবর্ণ বটে, তবে এর ফরাশী দাড়ী আছে—নাকের ডগার উপর একটা আঁচীল! সে দিন তার আর মক্কেলের কাজ করা হলো না। কারণ, ঝাঁকা ঝাঁকা সন্দেশ, বালুসাই, ক্ষীরমোহন সব আসতে সুরু হলো। মাটীর ভাঁড় এলো মাটীর গ্লাস, মায় কলাপাতা। মাটীর ভাঁড়ের দাম দিয়ে এসেছিল না কি তার সরকার—যার গলায় তুলসীর কণ্ঠী আছে। ময়রাকে খাবারের আদেশ দিয়ে এসেছিল উকীল বাবুর লোক—যার মুখে আছে বসন্তর দাগ!

এই সব লোককে বুঝিয়ে ঘরে ফেরাবার কসরৎ যখন করছেন উকীল বাবু—তখন দরজায় প্যাঁ-আঁ-আঁ ক'রে ব্যাগ পাইপ্ বেজে উঠ্‌লো।

তাদের থামাবে কি! রসুন-চৌকীর সানাইওয়ালা তান ধরলো ভৈরবীতে—কাদের কুলের বউ!

কাতর হয়ে মা জানকী যা বলেছিলেন, প্রাণের ভিতর থেকে মৃগাঙ্ক তাই বললে—"মা পৃথিবী, দু-ফাঁক হও, আমি প্রবেশ করি।" কিন্তু সে তো ধরার মেয়ে নয়, কাজেই তার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হলো!

মৃগাঙ্ক দু' পয়সা রোজগার করছে। তার দরজায় সাঁঝে সকালে পাঁচ-সাতখানা মোটর-গাড়ী দাঁড়ায়—এ কাণ্ড সহ্য করবার মত প্রকাণ্ড প্রাণ এ পল্লীতে কম লোকেরই ছিল। তার আত্মীয়-স্বজনও তার উপর বিরক্ত হতো তার সৌভাগ্য-লাভ-রূপ মহা-অপরাধের জন্য! সবাই তাই আজকের এই শুভদিনে টিট্‌কিরি মেরে রসিকতার পরিচয় দিলে।

একদল কাঙ্গালী "পাতের" খাবারের জন্য যথারূপে আগত হয়ে "জয় হোক", "জয় হোক" ব'লে চীৎকার করছিল। সেই দলের মধ্যে ছিল নিশিকান্ত আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বেঁটে বঙ্কা। এমন আনন্দ বহুদিন সে উপভোগ করে নি!

শেষে যখন একটা কাগজের হাতী এলো, আর তার সঙ্গে রাজ্যের ছেলের দল চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, তখন বাড়ীর মধ্যে অনুরোধময়ীর মূর্চ্ছা হলো। তাঁর হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম ছিল বহুদিন। দাসী এসে যখন সংবাদ দিল যে, মা ঠাকুরুণের অষ্টেলিয়া হয়েছে, তখন মৃগাঙ্ক পাগলের মত ছুটে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে। তার টেলিফোনের ফলে সদল-বলে পুলিসও সেই সময় এসে পৌঁছুলো। বে-গতিক বুঝে নিশি ও বঙ্কু ভীড় ছেড়ে চ'লে গেল।

পথে বঙ্কু বল্লে—নিশু, এ খেলা খেল্‌লে কেন?

নিশিকান্ত হেসে বললে—মুখ্যু বেটার একটু তমো হয়েছে। সেদিন আমার একটা লোক দু' শিশি কোকেন-সমেত ধরা পড়েছিল। তাকে পাঠিয়েছিলাম মৃগাঙ্কর কাছে। সে অনুনয়-বিনয় করেছিল কম ফী নেবার জন্য। তাকে মৃগাঙ্ক বলেছিল—আমার কি বাপু মেয়ের বিয়ে যে তোমার জন্য সস্তায় কেস করবো। লোকটা ছিল ব্যাণ্ডওয়ালা—অবসর-সময়ে কোকেন বেচ্‌তো। তাই উকীলের মেয়ের বিয়ে দিলাম আজ!

—কিন্তু মলো যে পোদ্দার বেনারসীওয়ালা—আরও পাঁচ জন।

—ওটা সাইড্‌-শো। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'লে উলুখড়ের প্রাণ বাঁচে না!

তার অকাট্য যুক্তিতে বেঁটে বন্ধু খুশী হয়ে একটা বিঁড়ি ধরালো।

—জজের বন্ধু—

যোধমল হনুমান-দাসের মনিব-গোমস্তা বলদেও দাসের দূরদৃষ্টির খ্যাতি বর্দ্ধমানের ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো। প্রথমে সে অতি-ক্ষুদ্র গোমস্তারূপে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে দোকানে ভর্ত্তি হয়েছিল। সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। এখন সে যোধমল হনুমান-দাসের বখরাদার-হিসাবে শূন্য বটে, কিন্তু প্রতাপে একাই একশো! ছাগল ভয়ে ভয়ে উপত্যকায় নেমে জল খায়; তার পর তুড়িলাফ্‌ দিয়ে শৈল-শির হতে শৈল-শিরে উঠে তুঙ্গ-শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে গিরি নদী উপত্যকার দিকে তাকায়! বলদেও দাস কাটগড়িয়াও

তেমনি উপেক্ষার দৃষ্টিতে বর্দ্ধমানের বাণিজ্য-প্রবাহ ও সঙ্কীর্ণ ব্যবসা-ক্ষেত্রকে দেখ্‌তো। ডাল চাল তিষি ভুষি সূতা কাপড় পাট গুণচট সকল ব্যবসাতেই মা-কমলা বলদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নভাবে হেসেছিলেন। যখন চিরদিনের চঞ্চলার একটু অস্বাভাবিক চেপে-বসি থমথমে ভাব দেখা গেল যোধমল হনুমান দাসের গদিতে, তখন বলদেও এক সরিষার তৈলের কল স্থাপনা করলে বৃহদাকারে, অপ্রশস্ত বাঁকা নদীর ধারে। এইবার গণ্ডগোলের দেবতা সুবুদ্ধি বলদেবের বিবেচনা-শক্তির মধ্যে সামান্য একটু ভেজাল মিশিয়ে দিলেন! বলদেও এখন অতি চালাক হয়েছে—পাট্টা কবুলতি চুক্তিপত্র নিজেই মুসাবিদা ক'রে উকীল-খরচা বাঁচায়। যে জমীর উপর তার কল প্রতিষ্ঠিত, সে জমী এক হীন-ভাগ্য গৃহস্থের। যে-দলিলের বলে বলদেও জমীর দখল নিলে, তার মুসাবিদার ফলে তাতে রহে গেল গলদ।

সরিষার তৈলে গোজার তেলের গোঁজামিল দিয়ে যোধমল হনুমান-দাস দেশময় বেরিবেরি, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ বিস্তারিত করলো! সবল ব্যগ্র-ক্ষত্রিয়ও রথ-তলায় তাদের কলের তৈলে-ভাজা পাঁপর খেলে অর্দ্ধরাত্রে পীড়িত হতো। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘরে এসে পড়লো অনেক সহস্র টাকা। তোষামোদ ক'রে দেশের ভদ্রলোককে এক জোড়া কাপড় বেচে যে কৃত-কৃতার্থ হতো, সেই বলদেওয়ের ব্যবহারে এখন আর সে বিনয়টুকু দেখা গেল না। কাজেই যাদের অবস্থা ছিল না ভাল, হাতে ছিল না অর্থ, তারা জোট বাঁধলো, বলদেও কাটগড়িয়াকে টেনে নামাতে মা-লক্ষ্মীর কোমল কোল থেকে। মাত্র পর-সেবা ব্রত উদ্‌যাপন করবার মানসে তারা জমীদারকে সুবুদ্ধি দিলে যোধমলের নামে উচ্ছেদের মামলা

করতে। যে-সব উকীলকে বলদেও এখন কাজ দেয় না, তারা অনেক আইন আর নজীর আলোচনা ক'রে দেখলে, বলদেওয়ের বিপক্ষে উচ্ছেদের রায় পাওয়া খুব সহজ কথা। তখন কলকজ্জা সরিষা গোঁজা চীনাবাদামের বস্তা প্রভৃতি নিয়ে উদ্ধত সবজান্তা বলদেও কোন্ চুলায় স্থানান্তরিত হয়, তা তার শত্রুপক্ষ দেখবে!

সদরালার আদালতে বলদেওয়ের হার হলো। ঢোলসহরতে শহরময় তাব বিপক্ষ পক্ষ পক্ষাধিককাল এ সমাচার প্রচার করল। দু'এক জন মধ্যস্থ জুটে জমীদারে ও প্রজায় সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করে নি, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। মাত্র চার হাজার টাকা সেলামীতে বলদেও মৌরসী পেতে পারতো। কিন্তু বলদেওয়ের তা হ'লে প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হতো। তাকে জজসাহেবের কাছে আপীল করতে হলো। রমারম্ ঝমাঝম্ লড়াই বাধলো! দু'পক্ষের দু'জন উকীল কন্যাদায় মুক্ত হলো, জনকতক উকীল মুদীর দেনা পরিশোধ ক'রে ফেললে।

অর্দ্ধেক সওয়াল জবাব শুনে জজসাহেব বাংলোয় গিয়েছিলেন লাঞ্চ খেতে। কাছারীর ময়দানে স্থানে স্থানে জোট বেঁধে লোক মামলার কথা বলছিল। নিজের কাজ ছেড়ে পরনিন্দার বিমল আনন্দে সারা শহর ছিল মশ্‌গুল। একটা টোক্‌রে কবি গাছতলায় ব'সে কাগজের ঠোঙার ওপর "বাঁকা"র সঙ্গে "বোয়ের শাঁকা" "তেলের কলে"র সঙ্গে "বংশ-গোপাল হল" মিলিয়ে এই যুদ্ধ বর্ণনা ক'রে কবিতা রচনা করছিল। বিনা ব্যয়ে সবাই যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠের উত্তেজনায় উৎফুল্ল!

এক নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করলে এই সময় ক'লকাতা থেকে আগত এক প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী আর পরিপাটী বেশে ভূষিত তার আরোহী।

লোকে ছুটে তাকে দেখতে গেল। সুন্দর চেহারা, চক্‌চকে ইংরেজী পোষাক, সোনার বর্ণের নেকটাই—তার অন্তর থেকে কত আধফোটা রঙের আমেজ নিজেকে দেখাবার চেষ্টা করছে। মাথায় ধপধপে সাদা টুপি, মুখে বাঁকা চুরুট! আগন্তুককে লোকে জজের কোর্ট দেখিয়ে দিলে সোৎসাহে। সে অমায়িকভাবে হেসে পেস্কারকে জিজ্ঞাসা কয়লে—হ্যারি—মানে—ফষ্টার কোথায়?

মিঃ হেনরী সিডম্যান ফষ্টার এম, এ-ক্যান্টব্‌ আই-সি-এস! সেই জেলা-জজকে এ বলে হ্যারি! আর তাঁব অপেক্ষা মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত! এ বাঙালী সুপুরুষ তা হ'লে কেউকেটা নয়! অবশ্য রাজ-বংশের কেহ নন—তাঁরা বর্দ্ধমানে সুপরিচিত। তবে কে এ ছদ্মবেশী জজ বন্ধু?

ঠিক সেই সময় পেস্কার মশায় এক মুলতুবীর দরখাস্তর সঙ্গে আট আনা হস্তগত করছে! এমন দুর্য্যোগে জজসাহেবের প্রিয় সুহৃদেব শুভাগমনে তার হৃৎকম্প হলো। কে জানে, আধুলীটা সাহেব দেখেছে কি না! বেচারা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলো। দু' হাতে যতগুলা সম্ভব, সেলাম করলে। অতি বিনীতভাবে বললে—স্যার, জজসাহেব লন্‌চো কর্ত্তে বাস্‌সাকে গেছেন।

—ওঃ।

তারপর যেমন বিজলীর ঝলকের মত সে এসেছিল, তেমনি তড়িৎ গমনে চলে গেল। গাড়ীতে ওঠবার পূর্ব্বে জনতার মাঝ থেকে সে অজানা জেনে নিল দুটা সংবাদ—আসানসোলের পথ আর আসানসোলের ডাক বাঙলার ঠিকানা। তারপর ভ্যাঁক ভ্যাঁক। স-আরোহী হাওয়া গাড়া উবে গেল।

লাল ডুম্বা

অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা চললো এই হারুণ অল্ রসিদ সম্বন্ধে। কেউ সিদ্ধান্ত করলে—সে অন্য জেলার জজ। কেউ শপথ করলে, সে বাঙলার লাট্ সাহেবের মন্ত্রী। কেউ বললে—সে ব্যারিষ্টার– জজসাহেবের সহাধ্যায়ী। কিন্তু সে জজ হেনরী সিডম্যান ফষ্টারের অন্তরঙ্গ বন্ধু—এ প্রস্তাব সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

বিশ্ব পরিশ্রান্ত হয়, কিন্তু বলদেও হয় না! তার মনের দৃষ্টিতে এক্স রশ্মি আছে, রমন রশ্মি আছে। যেখানে অপরে দেখে যবনিকা, কুহেলিকা প্রহেলিকা বা চীনের প্রাচীর, সেখানে বলদেও দেখে মনোরম লতা বিতান, পরিশ্রমীর কর্ম্মক্ষেত্র, লাভের নির্ঝরিণী, সুলেমান রাজার রত্নাগার! সন্ধ্যার পর গদীতে ব'সে ভুরা তামাক সেবন ক'রে বলদেও বুদ্ধির মূলে দিলে ধোঁয়া। সে তার বিশ্বাসী মন্ত্রী দুর্লভরত্ন সামন্তকে ডেকে অনেক পরামর্শ করলে। তার ফলে অর্দ্ধঘণ্টা পরে বলদেবের ফোর্ড গাড়ী সগর্ব্বে দুর্লভরত্ন বক্ষে ধারণ ক'রে অন্ধকারের অন্তর ভেদ ক'রে আসানসোলের পথে ছুটলো।

—চামচিকা—

আসানসোলের ডাক-বাঙলায় দোতলার ঘরে নিশিকান্ত একটা ছোট পেগ পান করছিল। বাবুর্চিখানায় আস্ত মোরগ সিদ্ধ হচ্ছিল। খানসামার ভারি স্ফূর্ত্তি। খোদা তায়ালার ফজলে বহুদিন পরে একটা মানুষের মত মানুষ এসে ডাক-বাঙলা অধিকার করেছে। নিশিকান্ত একটু বিরক্ত

হচ্ছিল। তাঁর হিসাব মতে বাদী-প্রতিবাদীর এক পক্ষের অন্তত: আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল। ক্ষোভের কারণ তার আত্মমর্য্যাদার দায়ে। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্ত কোন দিন ভুল হয় না।

তার অনুমতি নিয়ে খানসামা যখন দুর্ল্লভকে তার দরবারে নিয়ে এলো, তখন প্রকৃতির নিয়মগুলার উপর নিশিকান্তর আস্থা ফিরে এলো।

দুর্ল্লভ যখন বললে যে হনুমানদাসের লোক, তখন সাহেবের রসবোধ জেগে উঠলো।

সে বললে,—বাবা, হনুমান তো স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের দাস। তার আবার দাস। তুমি আবার তস্য দাস—চামচিকে।

—হুজুরের কাছে আর কি বলবো? সামান্য লোক। আমি হুজুরের দাস।

তার মিষ্ট বাক্যে হুজুর তুষ্ট হলো। সে তার চেহারার সুখ্যাতি করলে। তার মাথার টিকির দীর্ঘতার সংযমে আনন্দ পেলে। তার জামা দেখে বললে—বাবা, এ তো পাঞ্জাবী নয়, এ যে বাবা প্রাণ-যাবি জামা। যে রকম টাইট—দম বন্ধ না হয়।

দুর্ল্লভ টোপ ফেললে; বললে—হুজুর ব্যারিষ্টার সাহেব, আপনাব জেরা কি আর আমরা সহ্য করতে পারি?

এক পাত্র মধু পান ক'রে নিশিকান্ত বললে—বাবা, আমার সাত-পুরুষে কেউ ব্যারিষ্টার নয়।

—অর্থাৎ হুজুর জজ-সাহেব কি না।

—জজের চাপরাসীও নই, বাবা।

দুর্ল্লভ বিশ মিনিট মল্লযুদ্ধ ক'রেও বার করতে পরেলে না—হুজুর

কে? ইত্যবসরে হুইস্কির গন্ধে বেচারার বত্রিশ নাড়ী পাক খাচ্ছিল। নিশিকান্ত ভাঙ্গে তো মচকায় না। একুশ মিনিট দশ সেকেণ্ড বাদে সে আত্মপ্রকাশ করলে। সে ফিচিঙ্‌পুর রাজ্যের যুবরাজ। ফিচিঙ্‌পুর অবশ্য বাজে নাম। তার পিতৃদেব কোন্ রাজ্যের অধিপতি, তা সে বলবে না। হ্যারি ফষ্টার আর সে প্রথমে ইটনে, শেষে কেম্‌ব্রিজে সহপাঠী ছিল। আহা, বৃদ্ধ ফষ্টার সাহেব আর হ্যারির জননী তাদের উভয়ের মাঝে কোনও পার্থক্য দেখতেন না। স্কুল-কলেজের অবসরগুলা তার বার্কসায়ারে ফষ্টারদের গৃহেই কাটতো।

সায়রের মধ্যে বর্দ্ধমানের কৃষ্ণ-সায়রকেই দুর্লভ বড় ব'লে জানতো, বিলাতের সবই অদ্ভুত। সেখানে লোকে পুকুরের মাঝে ঘর বেঁধে বাস করে—এ সমাচারে সে মুগ্ধ হলো।

রাজপুত্র বললে—দেখ দুর্লভ, এ দেশে একটা ভুল ধারণা আছে যে, মেমেরা স্নেহ গোপন করে। এ একেবারে ভুল ধারণা। আহা! হ্যারির মা নিজের হাতে কাটলেট ভেজে কত না যত্ন ক'রে আমাদের খাওয়াতেন।

মেমেদের স্নেহ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করবার মাত্র একটা সুযোগ দুর্লভের জীবনে ঘটেছিল। গোলাপবাগের পুকুর-ধারে এক মেমের একটা ছোট জাপানী কুকুর তার গা বয়ে কাঁধের উপর উঠে টিকিতে টান মেরেছিল। দুর্লভ যখন ভয়ে দৌড়ে পুকুরের চার পাড়ে দেড় পাক ঘুরেছে, তখন মেমসাহেব মধুরকণ্ঠে তাকে বলেছিল—মাট গাবরাও বাবু, মাট ঘাবরাও। ঠিক হায়। কুটা হায়। মেমসাহেব নিজের হাতে কুকুরকে তার স্কন্ধ থেকে নামিয়ে তার বিশৃঙ্খল টিকিকে শৃঙ্খলে এনেছিল।

কাজেই রাজপুত্রের গল্প শুনে দুর্লভের সন্দেহ রইল না—বর্মার

ধারার মত ঝ'রে পড়ে মেমেদের স্নেহ ! স্নেহের জীব তার শীতল প্রবাহে নাকানি-চোবানি খায়।

রাজপুত্র বললে—দেখ রত্ন, তোমাদের দেশের মশাগুলা আমাদের দেশের দুর্গা-টুনটুনির মত।

—যে আজ্ঞে !—ব'লে দুর্লভ জীবতত্ত্বের এত বড় অসম্ভব বিবৃতিটা মেনে নিলে।

হুজুর ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁর পাঠান ড্রাইভার ব্যতীত আর কেহ অবগত নয়, রাজপুত্র এখন আসানসোলে।

খানসামাকে নগদ ষোল আনার ঝলক দেখিয়ে দুর্লভ টিপে দিয়েছিল। সে ঘন ঘন গ্লাস ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছিল—দমাদম সোডার বোতল খোলা হচ্ছিল। রাজপুত্রের প্রগল্‌ভতার জনক যে দুর্লভের ফিচেল বুদ্ধি, এ সত্য উপলব্ধি ক'রে দুর্লভ খুব আনন্দ লাভ করছিল। রাজাসাহেব তাকে অনেক পীড়াপীড়ি কর্‌লে মুরগী খাবার জন্যে—হুইস্কি পান কর্‌বার জন্যে। তিনি ন্যায়ের কষ্টি-পাথরে কষে তাঁর যুক্তির কৌলীন্য স-প্রমাণ ক'রে দিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়। দুর্লভ উগ্র-ক্ষত্রিয়। যা তাঁর পক্ষে খাদ্য, তা দুর্লভের পক্ষে অখাদ্য হতে পারে না। দুর্লভের কিন্তু সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় আস্থা চিরদিন। সে রাজা সাহেবের অনুরোধে কর্ত্তব্যজ্ঞান হারালো না।

আহারান্তে যুবরাজ বললেন—বাবা দুলু, এবার কবুল জবাব দাও তো, বিধি আমার ভাগ্যে আজ রাত্রে এ দুর্লভ রত্ন জোগালেন কেন ?

তার পর সে গান ধরলে—যদি বা মিলাল বিধি, তোমা হেন গুণনিধি—

তার দাড়ি ধ'রে বললে—ব'লে ফ্যালো বাবা রত্ন, কি মতলব! আমার কোন্ জিনিষটার ওপর ঝোঁক পড়েছে? হীরের আংটী, না মিস্ মেয়োর দেওয়া স্কার্ফ-পিন? কিন্তু ভুলো না বাবা, সুট-কেসে ছ-নলা রিভলভার আছে।

মহাকবি শেক্ষপীয়রের বর্ণিত নীতিতে বিশারদ ছিল সামন্ত—জোয়ারের জলে নৌকা না ভাসাতে পারলে পাঁকে প'ড়ে থাকতে হয়! সে মাহেন্দ্রক্ষণের সন্ধান পেলে। এবং হুজুরের শ্রীচরণে এবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে। তার লক্ষ্মীমন্ত মনিবের চারিদিকে ঈর্ষার ষড়যন্ত্র চলেছে। তাঁর মান ইজ্জৎ বাঁচে, তিনি যদি জজসাহেবের কোর্টের মামলাটায় বিজয়ী হন!

গম্ভীরভাবে রাজা বাহাদুর সমস্ত বিবরণ শুনলেন। এ মামলায় বলদেবের জয় হওয়া উচিত—সে কথা সত্য। কিন্তু—

দুর্লভ মনে মনে বল্‌লে,—ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। এইবার রাত্রি অবসান! প্রকাশ্যে বললে—হুজুর, আমার মনিব খরচপত্র করতে রাজি আছেন!

—খরচপত্র! মানে?

—মানে আর কি বলবো হুজুর, শুধু হাত কি মুখে ওঠে? যদি জজ সাহেবকে কিছু উপহার দিতে হয়—

—তবে রে শা—! গর্জ্জন ক'রে উঠলো যুবরাজ। গালাগালির চোটে তার স্বর্গীয় তিন পুরুষকে জিভ্ কামড়াতে হলো—অবশ্য স্বর্গে যদি জিহ্বা থাকে! নিশিকান্ত জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে তাকে প্রহার করলে। বললে,—আমার বন্ধু দেবচরিত্র! ফষ্টার ঘুষখোর? পাজী! বেয়াদব! চামচিকে!

লাল ডুম্বা

সেকেন্দর, সিরাজ বা নেপোলিয়ন বাহুবলে বিশ্ব-বিজয় করেছিল, এ যাদের ধারণা, তারা বিশ্ববিজয় রহস্যের অ আও জানে না। ধীরতার হাসি বড় যোদ্ধার অস্ত্রাগারের প্রধান আয়ুধ। চোখের সামনে তরবারির গায়ে বিজলি চমকাচ্ছে—সে সময় ধীরভাবে হাস্‌তে পারলে আততায়ীর নিজের উপর অবিশ্বাস গজিয়ে ওঠে—সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়! ‍দুর্লভরত্ন হাসি-বাণে অভিভূত করলে রাজপুত্রকে!

সে বললে,—বালাই! ষাট্! এমন অধর্ম্মের কথা আমার মুখ দিয়ে বার হবে না, যে মুখে সকাল সন্ধ্যা হরিনাম বার হয়। হরি! হরি! বনমালি!

সাহেব আশ্বস্ত হয়ে বললে—তাই বলো। ঘুষ খাবে থানার দারোগা —ঘুষ খাবে রেলের টিকিট কালেক্টর—ঘুষ খাবে,ঘুষ খাবে—

দুর্লভ কথা জুগিয়ে দিলে—রাজ-ষ্টেটের নায়েব গোমস্তা, ইষ্টীমারের সারঙ্‌।

—থাক্।

অনেক কাণার নাম হয় পদ্মলোচন, অনেক কুঁজো-ভাঙ্গা, কাচ-ভাঙ্গা, দোয়াত-ওল্টানো ছেলের নাম বাপ মা রাখে সুশীল, নয় সুবোধ। কিন্তু দূরদর্শী দুর্লভের পিতা তার নামকরণ করেছিল দুর্লভরত্ন—এক দৈব-প্রেরণার বশে!

সে বললে—ঘুষ হলো ঘুষ! তবে হাঁ—উপহার যদি বলেন—

—কবে বললুম রে বেটা!

—আজ্ঞে, ধরুন, যদি বলেন,—তা হ'লে? উপহার হলো, মানীর মান রক্ষা, মহতের মহত্ত্ব-পূজা, দেবতার নৈবেদ্য।

এবার রাজাবাহাদুর বুঝলেন যুক্তিটা।—দেবতার নৈবেদ্য! চাল কলা সন্দেশ—মায় খিচুড়ী ভোগ! তুই বেটা রঘুনন্দনের পুত্র!

—আজ্ঞে, তা হ'লে মহারাজই রঘুনন্দন। কারণ, আমি আপনারই অধম সন্তান।

—বিপন্ন—

সেদিন রবিবার। ফষ্টার সাহেব সারাদিন টেনিস্ খেলেছেন; সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে স্নানান্তে রায় লিখছিলেন। দু'পক্ষের হোমরা-চোমরা উকীলদের সুযুক্তি, অযুক্তি, কুযুক্তি—সব তাঁর মনে গাঁথা ছিল! সময় নষ্ট করার পাঠ এ ইংরাজ যুবক পড়েন নি! মেম সাহেব বে-গতিক বুঝে কালেক্টরের স্ত্রীর সঙ্গে কাটোয়ার পথে মোটর চালিয়ে সান্ধ্য প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে বেরিয়েছেন। চাপরাশির দলও অবসর বুঝে ঘুরতে বেরিয়েছিল। বাঙলার পিছনে ছিল নদেরচাঁদ চাপরাশি একা—আফিমের পিনিকে সে খদ্যোতের আলোয় বিবাহ উৎসবের বাঁধা রোশনাই পরিকল্পনা করছিল!

অকস্মাৎ সাহেবী-পোষাক-পরা একজন লোক সাহেবের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো। ফষ্টার অপরিচিতের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন। আগন্তুক বিনীতভাবে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করলে হাঁপাতে হাঁপাতে। বিনা-অনুমতিতে ঘরে-ঢোকা-বে-আদবকে ঘর থেকে বার করবার বাসনা সাহেব দমন করলেন, তার দীর্ঘশ্বাস, হাঁপানি, বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি,

আর অব্যক্ত কাতরতা দেখে! সাহেব তাকে বসতে চেয়ার দিলেন. তার এমনভাবে ঘরে ঢোকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

আগন্তুক অবশ্য নিশিকান্ত। সে বললে,—সাহেব, বড় বিপদে পড়েছি। আমি ময়নাপুরের জমীদারের ছেলে। বর্দ্ধমানের রাজসরকারে পত্তনীর টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলাম—পথে দুটো লোক আমার সঙ্গ নিয়েছে। একবার তারা আমার গাড়ীর সামনে তাদের নিজেদের ভাঙ্গা ফোর্ড ফেলে গাড়ী থামাবার চেষ্টা করেছিল। আপনার ফটকের সামনে আমি গাড়ী থামালাম। তাই দেখে তারা পালিয়েছে।

সাহেব যুদ্ধে গিয়েছিলেন। নিজে কাপ্তেন! এত বড় একটা লম্বা-চওড়া লোকের এমন "মুরগীর-ছানা-হৃদয়" তাঁর নিকট পরিহাসের সামগ্রী বলে বোধ হলো!

সাহেব একটু মজা করবার জন্য বললেন,—আমার কাছে দুটা রিভলভার আছে—চলো না বাবু, তাড়া করি।

ময়নাপুরের জমীদার-পুত্র আমতা আমতা করতে লাগলো। সাহেব বললেন,—ভয় নাই! চলো।

অগত্যা সে একটা টাকার তোড়া সাহেবের মেঝের উপর রেখে কুঠীর বাহিরে এলো।

বলদেবের হৃদয় খুব উচ্চ হ'লেও টাকা-পয়সার বিষয়ে সে ছিল হিসাবী। সে নিজে ফটক অবধি এসেছিল দেখতে—যে, খামখেয়ালী রাজার ছেলে হঠাৎ খেয়ালের ধমকে সাহেবের প্রাপ্য টাকাটা নিয়ে ফিচিঙ্‌পুরে না পালায়! সে দেখলে, রাজপুত্রের কাঁধ ধরে সাহেব হাসি মুখে ফটকের দিকে আসছেন। এ হরিহর-মিলনের সুখ-চিত্র আরও

উপভোগ করবার জন্য সে গা ঢাকা দিয়ে একটা ঝোপের মাঝে মিলিয়ে গেল। অভুক্ত মশার দল সানন্দে ভুরি-ভোজনের উৎসবে রত হলো—গুণ গুণ-গান গেয়ে।

সাহেব ফটকের ধারে এসে নিশিকান্তর ছ'সিলিণ্ডার চক্চকে বুইক দেখলেন। আর তাঁকে পায় কে? আস্তিন গুটিয়ে দুজনে লেগে গেলেন তার কল-কব্জা পরীক্ষা করতে। বলা বাহুল্য, ময়নাপুরের উপর সাহেবের ভক্তি হলো। মনে মনে তিনি মুখস্থ করলেন,—মুনাইয়াপোর!

সাহেব নিশিকান্তর সঙ্গে ঘরে ফিরে গেলেন। বললেন,—ফোর্ডের নম্বর রেখেছ?

—উঁহু।

সাহেব হাসলেন—হেসে বললেন,—তোমরা যদি একটু সাহসী হতে তো তোমাদের কংগ্রেসের কথাগুলা আমরা মন দিয়ে শুনতাম।

—কংগ্রেসের কথা না শোনায় আমাদের কোনো ক্ষতিই হয় নি। ভগবান কংগ্রেসের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

সাহেব বুঝলেন—লোকটা প্রকৃতই ভাল। আভিজাত বাঙ্গালী—খদ্দরধারীদের মত নষ্ট-বুদ্ধি নয়।

তিনি হেঁসে বল্লেন—কেন কংগ্রেসের ওপর তোমার শ্রদ্ধা নেই কেন?

—শ্রদ্ধা! অনেক মহাপ্রাণ লোক কংগ্রেসের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন—তাঁরা ধন্য—

—ঠিক্ কথা। কিন্তু যারা না বুঝে চীৎকার করে আর ভাবে তারা প্রকাণ্ড দেশ-হিতৈষী তোমাদের দেশের অমঙ্গল তারা।

—কি আর বল্‌ব সাহেব। তারা চায় রাজত্ব করতে কিন্তু তাদের আলস্যের ফলে—আমাদের রাজা সবাই—রান্নাঘরের উড়িয়া পাচক থেকে রাঘব বোয়াল মারবাড়ি ব্যবসাদার পর্য্যন্ত। আমরা চেঁচাই আর পাঁচজনে আমাদের লুটে—আমাদের পয়সা দিয়ে শিক্‌লী কিনে আমাদের পায়ে লাগায়।

সাহেব উচ্চহাস্য কর্‌লেন। জমিদারের ছেলে মেরে কেটে বাঘ-মারার গল্প কর্ত্তে পারে। এ ভদ্রলোক এমন মার্জ্জিত ইংরাজিতে এত সামাজিক দর্শন বর্ষণ কর্ত্তে পারে—এ একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কাজেই তাদের মধ্যে কতকটা ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে উঠ্‌লো।

তাদের মধ্যে আরও অনেক কথা হ'লো।

নিশিকান্ত বললে,—সাহেব, এতটা অনুগ্রহ যদি করলেন তো অনুগ্রহ পুরামাত্রায় করুন। আজ রাত্রের মত আমার এই পাচ হাজার টাকার থলিটা আপনার ঘরে থাক, কাল সকালে আটটার সময়ে এসে আমি নিয়ে যাবো।

সাহেব হাসলেন। নিশিকান্ত না-ছোড়বন্দা। শেষে সাহেব গালা এনে, বাতী এনে নিজের হাতে থলির মুখ শীল করলেন। নিশিকান্ত "কি করেন, কি করেন" বলে বাধা দিলে—সাহেব সে-বাধা মানলেন না।

অনেক স্তুতিবাদ করে নিশিকান্ত বাহিরে এলো; গাড়ী নিয়ে নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের ধারে গেল। বলদেব শেষ অবধি দেখলে, খালি হাতে রাজপুত্র বাহিরে এলো! তার উদার মনে সন্দেহ ছিল না। তবে টাকা-পয়সার কথা! তাই মশার কামড়, গায়ের উপর শিশু-ভেকের তুড়িলাফ প্রভৃতি সামান্য অসুবিধা সহ্য করে জঙ্গলের মধ্যে বসে রাজপুত্রের ক্রিয়াকলাপ সে

লক্ষ্য করছিল। দুর্লভের উপর তার স্নেহের মাত্রা বর্দ্ধিত হলো। মনে-মনে সে ভেঁজে নিলে, বেতন বাড়াবার কথা তুল্‌লে দুর্লভকে সে কি সব মিষ্ট ভাষে তুষ্ট করবে! অচিন্‌ দেশের রাজপুত্রকে বিধি বর্দ্ধমানের রাঙামাটির পথে না পাঠালে তার মান ইজ্জৎ সবই তো দামোদরের বানে ভেসে যেতো! এখন অন্ততঃ বাংলাদেশে তার সমতুল্য মাথাওয়ালা ব্যবসাদার কেউ ছিল না।—এ সার সত্য সে অনুভব করলে। আর পাঁচ হাজার টাকা! আরে রামচন্দ্র! ওজন কম আর ভেজালের কল্যাণে সে টাকা তুলতে ক'দ্দিন আর লাগবে!

মাঠের ধারে এসে নিশিকান্ত যোড়শোপচারে তার পূজা গ্রহণ করলে। পরোপকার সাধবার জন্য তাকে একটা গর্হিত কাজ করতে হলো—এ অনুতাপ সে যতই ব্যক্ত করলে—বলদেব ও দুর্লভের হৃদয় উপবন থেকে ভক্তি-কুসুম ততই তার পদতলে বর্ষিত হতে লাগলো।

প্রভাতে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে সোনার হাত-ঘড়িতে নিশিকান্ত দেখ্‌লে, পৌনে আটটা। এই বহুমূল্য হাত ঘড়িটা ডালহৌসী স্কোয়ারের এক নামজাদা ঘড়ি-বিক্রেতার হৃদয়ে যে রহস্যের সৃষ্টি করেছিল, সে রহস্যের যবনিকা আজ তিন বৎসরের মধ্যে ওঠেনি। জগতে এক জন মাত্র জানতো, কেমন ক'রে সেটা তাদের কেস্‌ থেকে প্রথমে তার ফতুয়ার পকেটে, শেষে তার মণিবন্ধে উঠেছিল! সে রহস্যজ্ঞ ঘড়ির এখন অধীশ্বর—নিশিকান্ত।

সাহেবের নিকট টাকার তোড়া নিয়ে ময়নাপুরের জমীদার-তনয় কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করলো। শক্তিগড়ের লেভেল-ক্রশিঙের অব্যবহিত দূরে সে গাড়ীর নম্বরটা বদলে নিলে। তার পাক্কানো-গোঁফ-

হলো অন্তর্ধান, চিবুকের নীচে একটা তে-কোণা ছোট দাড়ি গজিয়ে উঠলো ; এবং দেহে উঠলো ধুতি-পিরহান, আর বাঁ-দিকের গালে হলো একটা কাটা দাগ।

বেঁটে বঙ্কু বললে,—এ রকম বাঘের মুখে গিয়ে লাট্টু খেলায় লাভ কি, ওস্তাদজী? পাঁচ হাজার টাকা তো মণখানেক কালাচাঁদ রপ্তানী করলেই তোমার ঘরে আসে।

নিশিকান্ত বললে,—টাকা তো হাতের ময়লা—পুকুরের মাছের মত। যতক্ষণ না ধরা দেয়, তার উপর শিকারীর ঝোঁক থাকে। লোকে দশ সের কাৎলা কি খাবার জন্য ধরে, না, ধরবার সুখের জন্য? বিস্তৃতি চাই—দেশদেশান্তে যাওয়া চাই, নব নব জ্ঞান আনতে।

বেঁটে বঙ্কু বুঝলো, ডুব জলে গিয়ে পড়েছে—সে একটা বিড়ি ধরালো।

—মিঃ এন্. কে. রায়—

নিশিকান্ত অপরাধ করতো রাজার আইন ভেঙ্গে, আর পাঠ করতো দেশী-বিদেশী সাহিত্য। অবশ্য কনান ডয়েল, এডগার ওয়ালেস, লিকো প্রভৃতি পড়তো সে জ্ঞান-বিস্তৃতির জন্য—নূতন নূতন "কাজের" তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ব্যতীত সকল রকমের সাহিত্যের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল। সে ফ্রয়েডকে বোকা ভাবতো, বেদান্ত ছিল তার প্রিয়। তাই সে জানতো, মানুষ যা-কিছু করে, সত্যের

আবরণ খোলবার জন্য,—যৌনভাবের পরিণত বা দমিত প্রবৃত্তির বশে নয়! রোজ প্রভাতে উঠে সে গীতা পাঠ করতো; শনি-মঙ্গলবারে কালীঘাটে আরতি দেখতে যেত। সে সময় গৃহস্থের মেয়ের লাখ টাকার সোনাদানা তার দশ আঙ্গুলের তিন আঙ্গুলের অন্তরে থাকলেও সে-গহনা গৃহস্থের মেয়ের গায়েই থাকতো, অঙ্গচ্যুত হতো না!

এমন ডবল জীবন কে না যাপন করে? দেশবন্ধু পার্কে বক্তৃতার চোটে ব্রিটিশ-সিংহকে যে খোঁচা দেয়, গৃহে সেই ব্যক্তিই গৃহকর্ত্রীর তর্জ্জনীর হেলনে তিন গ্লাস বরফ-জল পান করে। গৃহে নিশিকান্ত ছিল—মিঃ এন, কে, রায়—জেনারেল অর্ডার-সাপ্লায়ার। ক্লাবে মিঃ রায়কে সবাই সম্মান করতো। ফ্রি-মেশনরিতে সে পাষ্ট-মাষ্টার। এ জীবনে সে গোঁফ-দাড়িহীন উদার সুপুরুষ, রসিকতার ইন্‌কিউবেটর। বাড়ী বালীগঞ্জে—প্রতি ঋতুতে তার বাগানে ফুটতো মরশুমী ফুল। তার পুস্তকাগারে জিনসের মিষ্টিরিয়াস ইউনিভার্স থেকে কাশ্মীরী কোক-শাস্ত্র অবধি সমস্ত অভিনব পুস্তক সঞ্চিত ছিল। তার পাপের কোন চিহ্ন গৃহের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না। এখানকার সরকার-আমলারা তার চালানী কাজের সহায়ক ছিল। কোকেন আফিমওয়ালা বা চোর-জুয়াচোর কেহ জানতো না, তার বালীগঞ্জের বাড়ী। এমন কি, বেঁটে বঙ্কুরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

সহরের অন্যান্য দু' তিন স্থলে তার ঘাঁটি ছিল। যারা কাজ করতো, তারাও সে ঘাঁটি জানতো না। সেখানে তার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল, যারা তার কাছ থেকে নিয়ে যেত হুকুম। তার বাসস্থানের সঙ্গে এই সব স্থানের যোগসূত্র ছিল তার পাঠান ড্রাইভার, যার বুকে তপ্ত লোহার

শলাকা বিদ্ধ করলেও মুখ ফুটে একটা গোপন কথা প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা ছিল না !

মিঃ এন, কে, রায় অর্ডার-সাপ্লায়ারের বাংলা নাম ছিল, নির্ম্মলকান্ত রায়। তার সে-জীবনের পরিচিতরা কেউ তাকে নিশিকান্ত বল্‌তো না। বাড়ীতে তার বিশ্বাসী সরকার নদেরচাঁদ সকল কাজ করতো, কেবল বেতনের বদলে নয়, ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্ররোচনায়। কারণ, নির্ম্মল বাবু ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ, গীতা পাঠ কর্‌তেন ; আর সরকারটি ছিল বৈষ্ণব।

সকালে তার কর্ম্ম-কক্ষে নির্ম্মল কাজে ব্যস্ত। ঝক্‌ঝকে-তকতকে মেহগনি-টেবিল, তার উপর মোটা কাচ পাতা। একটা রূপার চৌকা শালবোটে অনেকগুলো ফাউন্টেন পেন। সম্মুখের দেওয়ালে পরমহংস-দেবের চেহারা। নদেরচাঁদ এক আগন্তুকের আগমন-সংবাদ জানালো।

অভিবাদন করে নির্ম্মলবাবু আগন্তুককে বসতে বললো। আগন্তুক যুবা। গায়ে খদ্দর কামিজ, পাযে সেলিম-শ্লিপার। গোঁফ দাঁতের বুরুশের আকারের। মাথার মাঝে টেরি, চুলগুলা পিছন দিকে আঁচড়ানো। মুখে তিনটি ব্রণের দাগ।

আগন্তুক পরিচয় দিল—নাম সুচিন্ত্য দস্তিদার—প্রফুল্ল-তেলি-সিনেমা লিমিটেডের ক্যানভাসার।

—বেশ! বেশ! এই সব ভিন্ন জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা থেকেই জাতীয় উন্নতি হবে। আর তিলি-জাতি ধনে মানে আমাদের সমাজে বড়। রায়েরা আছেন, পালেরা—

—আজ্ঞে না। আপনি ভুল করছেন। এটা তিলি-জাতীয় কোম্পানী

নয়। তেলিভিসান শুনেছেন, বোধ হয়! বিদ্যুতের সাহায্যে দূরের বস্তু দেখতে পাওয়া যায়!

—তাই না কি! ওঃ! আমি অত লেখাপড়া শিখি নি। একটা বিড়ি খান।

সোনার বিড়িদান থেকে দস্তিদার একটা বিড়ি নিলে। নির্ম্মলকান্ত নিজে ধরিয়ে দিলে। বার দুই "বিলক্ষণ" "বিলক্ষণ!" ব'লে পরে বেশ সরল ভাবে টানতে লাগলো।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিল সুচিন্ত্য দস্তিদার। ব্যবসাটা ভারী লাভের। সাধারণ সিনেমায় পরিচালক রাখতে হয়—তাদের বেঁতন দিতে আর হ্যাপা-সামলাতে কোম্পানীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তার পর 'ষ্টার্শ' বা "তারাদল"—তাঁদের মন আর অর্থ যোগাতে কোম্পানীর লাভের গুড় পিঁপড়ের পেটে যায়!

—তাই না কি! এত ঝঞ্ঝাট! আমরা আট আনা পয়সা ফেলে সিনেমা দেখে আসি, ভাবি, কল চালিয়ে দিতে পারলেই বুঝি ছবি হয়।

—এই তো রহস্য তেলি-সিনেমার। সত্যই কল-চালিয়ে দিলে ছবি হবে।

সে আরও কত কি বোঝালে। ধরুন, বিলাতের পিকাডিলির একটা ছবি চাই। ব্যস্! কলকাতায় বসে পিকাডিলি ফোকাস করে দিলেন —আর এখানে কল ঘোরান, একেবারে সিনেমার ছবি!

—বাঃ, ভারি মজা তো।

—মজা বলে মজা! এমন কি, ছবিরও প্রয়োজন নাই। কল টিপে

দিলে একেবারে ছায়াচিত্র পর্দ্দার উপর দেখবেন—হলিউডের মহলা—গ্রীসের রাজপুত্র স্নান কচ্ছে—কামাল পাশা নেমাজ পড়ছে।

নির্ম্মলকান্ত ভাবছিল—ছুঁচো বেটা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বাঁধতে এসেচ, ওরে বাবা, জুল-জুল করে চারিদিকে তাকায় যে! একে হাতে রাখা উচিত।

নির্ম্মলকান্তর বোকার মত চাহনি সকল কথায় বিস্ময়, জাগিয়ে তুলছিল দস্তিদারের মনে কল্পনার টেলিভিসন চালাতে। নিশিকান্ত নীরবে প্রেরণার প্রতীক্ষায় বসেছিল—লোকটা ধোঁকাবাজ? না, টিক্‌টিকি? একে হাতছাড়া করলে পরে অনুশোচনা হবে। সে শেয়ারের মূল্য জিজ্ঞাসা করলে—কোনো ছাপানো প্রস্পেক্টস্ আছে কি না, তাও জিজ্ঞাসা করলে।

—ছাপার খরচা। এ কোম্পানীর বিশেষত্ব হলো ব্যয়সঙ্কোচ। বাজে খরচের পাঠ এ কোম্পানী পড়েনি।

—ও! তাই নাকি! বাঃ! এমন কোম্পানি তু'চারটে চললে বাংলার দারিদ্র্য-সমস্যা উঠে যাবে।

—দারিদ্র্য-সমস্যা! ক্রোর-পতি-সমস্যার জন্য বিশেষ আইন তখন পাস করতে হবে।

একটা টানার ভিতর থেকে মিঃ রায় নগদ তিনশো টাকা বার করলেন। বললেন—তা হলে আপাততঃ আমি তিন হাজার টাকার শেয়ারের দাদন দিলাম। পরে আরও নেবো।

এবার সুচিন্ত্য একটু ইতস্ততঃ করলে। নগদ তিন শত টাকা! না নিলে টাকাটা যায়—আবার ধরা পড়বার আশঙ্কা। কি করে? অগত্যা

হাত পেতে তাকে তিনশত টাকা নিতে হলো। নির্ম্মলকান্ত তাকে কাগজ দিলে—কলম দিলে; তাকে দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিলে। সুবোধ বালক যা পায়, তাই খায়—সেই রকমের ভালো মানুষের মত সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করলে। তার বাগ্মিতার উৎস বন্ধ হয়েছিল—কথার বদলে একটা অব্যক্ত পুঁটুলি গলার কাছে অনুভূতি তুলছিল!

শরতের মেঘ থেকে বাহিরে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। দস্তিদারের সঙ্গে গল্প করতে করতে নির্ম্মলকান্ত বাহিরে এলো। বাগানের এক পাশে এক খণ্ড বাদামী জমির উপর টক্‌টকে লাল কেনা ফুটেছিল। তাদের হাসি-মুখ দেখে দস্তিদার-মশায়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো। সে তাদের সুখ্যাতি না করে থাক্‌তে পারলো না।

—আপনি ফুল ভালবাসেন, শ্রীমন্তবাবু?

—আজ্ঞে, সুচিন্ত্য।

—ও! হ্যাঁ! সুচিন্ত্যবাবু! আপনি ফুল ভালবাসেন?

—ফুল ভালবাসি না তো জীবনে কি ভালবাসি! আমাকে এক দিকে এক থালা সন্দেশ দিন, তার সঙ্গে দু'টো ল্যাঙ্‌ড়া আম; আর অন্য দিকে দিন একটা ফুলের তোড়া! আমি সন্দেশ ফেলে ফুলের তোড়া নেবো।

—বাঃ! বেশ! বেশ! একটু অপেক্ষা করুন।

নির্ম্মলকান্ত ঘরের ভিতর থেকে একটা ক্যামেরা নিয়ে এলো। দস্তিদারকে ক্যানার মাঝে দাঁড় করিয়ে তার ফটো নিলে। ফুলের বন্ধু সুচিন্ত্য কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে বিদায় নিল।

পথে বার হয়ে বহুবার সে পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগলো। না,

কেউ অনুসরণ করছে না। সে হাসবে কি কাঁদবে, ঠিক করতে পারলো না। যদি জুয়াচোর হয়, তো গভীর জলের মাছ! আর যদি সরল অমায়িক হয় তো উকীল মৃগাঙ্ক নির্ব্বোধ তাল-কাণা।

সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠের মাঝখানে পুকুর-ধারে বসে নিশিকান্ত বেঁটে বন্ধুকে বলেছিল,—কেবল চেহারা নয়, তার হাতের পাঞ্জার ছাপ অবধি তুলে নিয়েছি।

—কি রকম করে তুললে?

—বুদ্ধি চাই মাই ডিয়ার সাড়ে চার ফুট, বুদ্ধি চাই। তাকে একটা ফাউণ্টেন্ পেন দিয়েছিলাম লিখতে—পেনের ছু'টা প্যাচ খুলে। অচিরে তার বুড়ো আঙ্গুল কালিতে ভর্ত্তি হয়ে গেল। আমি ভদ্রতা দেখিয়ে ব্লটিং কাগজে তার হাত মুছিয়ে দিলাম। এমন কায়দায় যে, তার মনে মোটে সন্দেহ হলো না—আমি তার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে নিলাম! এটা ঠিক যে, লোকটা পুলিসের গোয়েন্দা নয়। হয় এমেচার টিক্‌টিকি, না হয় জুয়াচোর।

—প্রতারিত—

নিশিকান্ত তার নিজের প্রণালীতে অর্থোপার্জ্জন করবার কাজে বল-প্রয়োগ বা উপদ্রব—এ ছুটো বস্তু বড়ই অপছন্দ করতো। তার জীবনে আর একটা লক্ষ্য ছিল—যেন তার অন্তরের আনাচে-কানাচে স্ত্রীলোকের

চিন্তা না উঁকি-ঝুঁকি মারে। সে জানতো, প্রেম দুর্ব্বল-হৃদয়ের লক্ষণ আর মন্ত্রগুপ্তির অন্তরায় হলো এই স্ত্রীজাতির প্রগল্‌ভতা।

সেদিন কিন্তু তার জীবনের এই দ্বিতীয় লক্ষ্য-বিষয়ে মনটা প্রহরীহীন দুর্গের মত সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল।

তার অর্থের মোহ কেটেছিল। কেবল অভ্যাস খারাপ হবার ভয়ে নিজের হাতে দু'একটা "কাজ" করতো। সেদিন সে ঢুকেছিল ডালহৌসী স্কোয়ারে ঠাকুরলাল হীরালালের দোকানে। নীহারিকার আকারে তার মনের আকাশে ভাসমান ছিল—তার কর্ত্তব্য পথ। সে যে ঠিক কি করবে, তা জানতো না। সে যখন জহুরীর দোকানে প্রবেশ করলে, অপর দিক হতে তখন এক সুন্দরী যুবতী প্রবিষ্ট হলো সেই দোকানে। প্রহরীহীন দুর্গের মত তার মনে আলোর জ্যোতির আকারে এই সুন্দরী তরঙ্গায়িত হলো। সত্যই সেদিন তার পরিখায় একখানা ভাঙা পাথর ছিল। বসন্তের হাওয়া-লাগা দেহে যেমন শ্যাম্পেনের নেশা বিজলী-গতিতে চলা-ফেরা করে, সুন্দরীর রূপ-মদিরায় তেমনি তার রক্তের স্রোতের সঙ্গে মিশে গেল—সমগ্র তরুণীমূর্ত্তিট—তার সোনার চশমা, হবল্-করা শাড়ীর আঁচল, পায়ে-রেঙ্গুনের ভেলভেট-চটীটি পর্য্যন্ত নিয়ে। সে যেন শিরাজীর নেশা—তার হৃৎপিণ্ডে উপর্য্যুপরি গোটা আষ্টেক দমক দিল।

দোকানের দ্বারে ছিল এক সশস্ত্র নেপালী। বাবুরা ছিল ভিতরে। মেয়েটি সোনার হাত-ঘড়ি আর কজীর বন্ধনীর জঙ্গলে গল্পের রাজকুমারীব মত পথহারা হয়ে একটু অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দিল।

প্রত্যুৎপন্ন-মতি নিশিকান্তর সেদিন মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল। সে একটা ঘড়ি দেখিয়ে বল্লে—এটি বেশ।

যুবতী তার মুখের দিকে চাইলো। সুন্দর-সৌম্যমুখ, মিষ্টকণ্ঠ এবং নির্ব্বাচন-শক্তিও শিল্পীর মত! যুবতীর নাম পারুল।

একটা সিঁদুরের স্রোত তার মুখখানিকে রাঙিয়ে তুললো। সেই হলো নিশিকান্তর ত্র্যহস্পর্শ-যোগ! তার পর তার সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত হলো যখন হাসির চাপে যুবতীর দুই গালে দুটি টোল-খাওয়ার দাগ দেখা দিল।

—আর ব্যাণ্ড?

কৃতজ্ঞ নিশিকান্ত পাতার বুনানী বন্ধনী দেখিয়ে দিল। ঠিক্ সেই সময় দোকানের বিক্রেতা এলো। সশ্রদ্ধ নমস্কারের পর সে তাদের নির্ব্বাচিত ঘড়ি ও মণিবন্ধ বার করে দিল। ভাঙা বাংলায় বললে—দাদাবাবু ঠিক্ বহুৎ আচ্ছা সেটা পছন্দ করছেন।

দাদাবাবু! যুবতীর কৌতুকের স্পৃহা উত্তেজিত হলো দাদাবাবু শুনে। লজ্জাকে সাইডিঙে ঠেলে দিল তার রসপ্রিয়তা! চোখ-মুখের হাসি সামলাতে গিয়ে পারুল আরও বিকট কাণ্ড করে বসলো।

পারুল বললে,—খোক্ দাদাবাবু—খোক্—খোক্ দেখুন তো খুক্—দাদাবাবু—খোক্-খুক্-উক্—হাতে ঠিক হয়েছে—খুক্ কি না?

শরবিদ্ধ নিশিকান্ত! গরীব বেচারা! তার বাক্-শক্তির সেই দশা হলো রাহুর দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডের যা ঘটেছিল! বহু কষ্টে সে বললে—বেশ!

মনে করলে, কথাটা সে উচ্চারণ করেছে! কিন্তু সেই মনেরই একদিক থেকে সন্দেহ জাগলো—বোধ হয় কথাটা উচ্চারিত হয় নি!

পারুল নানাপ্রকারে হাত ঘুরিয়ে শূন্যে অনেকগুলা বৃত্তাংশের

সৃষ্টি করে বললে,—দাদাবাবু, কি বলেন? এইটেই মানিয়েছে? আমার কব্জী বড্ড মোটা—না দাদাবাবু? টেনিসের ড্রাইভ করে করে।

নিজের আনন্দের ফোয়ারার জলে নিজেই হাবুডুবু খাচ্ছিল—তরুণী পারুল!

বললে—আচ্ছা, বাবাকে দেখিয়ে আসি দাদাবাবু কি বলেন?

কি আর মাথামুণ্ডু বলবে দাদাবাবু? তার মনের মাঝে বইছে তখন আশ্বিনের ঝড়!

বহু কষ্টে দাদাবাবু বললে,—নিশ্চয়।

পারুল দরজার দিকে গেল কদমে। তখন ফিরে এসে বললে—ও মা! আমি কি বোকা দাদাবাবু! দামটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

গুজরাটী ভাষায় লেখা টিকিট দেখে দোকানদার বললে,—তিনশো ষাট টাকা।

হাসি-মুখে পারুল দোকানের ফটক পেরিয়ে গেল। এখন আপনার জন্য একটা ঘড়ি বাছা ভিন্ন দাদাবাবুর আর গত্যন্তর ছিল না। তার হাতের সে ক্ষিপ্রতা ছিল না। আঙ্গুল দক্ষতা হারিয়েছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষণ—অবশ্য দিবস-রজনী নয়—উনিশ-মিনিট—সে যেন কার আসার আশায় রইলো! চমকিত প্রাণ, চকিত শ্রবণ ইত্যাদি ইত্যাদি!

কত রকমারি পথেরশব্দ তার কানের মাঝে আশা, নিরাশা ও বৈরাগ্যের লহর তুলছিল মিনিটে ঊনত্রিশ বার!

বিশ মিনিট গতে দোকানদার বললে—বাবুজী, বাই তো ফিরলো না! পছন্দ হয়েছে বোধ মানি!

সর্ব্বনাশ! বাই যে তাকে বায়ুগ্রস্ত করে গেছে। অমন চলচলে

রূপ-মাধুরী যার—সে তার অপরিচিতা—এ সমাচার বিদেশী গুজরাটী দোকানদারকে সে দেয় কোন্ প্রাণে। বিশেষ যখন তার সঙ্গে সে ভ্রাতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ। তার জুয়াচুরি-ক্ষেত্রের বহুদর্শিতার দিক থেকেও সে দেখলো, এত ঘনিষ্ঠতা অপরিচিতার সঙ্গে—জহুরী সেকথা বিশ্বাস করবে না। যুবতীর পিতা নিশ্চয়ই বাইরে গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। পাঁচরকম চিন্তার ফলে সে কতকটা কলের পুতুলের মত জবাব দিল,—ঠিক হ্যায়।

কিন্তু আরও পাঁচ মিনিট গেল। এবার প্রেমের দেবতাও গা-ঢাকা দিলেন। আর এক ভাবে সে আত্মহারা হলো। ছি! ছি! আজ শত-যুদ্ধের বীর সে—একটা মেয়ের কাছে পরাজিত হলো। কিন্তু স্ত্রী-সংস্করণ এই জুয়াচোরের সাহসের উপর তার শ্রদ্ধা হলো।

দোকানদার তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। ব্যাপারটা তার কাছে ভাল বোধ হলো না। একজনকে বন্ধক রেখে অপরে মাল নিয়ে যায়, শেষে বন্ধকী ব্যক্তি বলে, সে নির্দ্দোষ। জহুরীর মাল যায়—পুলিস বলে—ষড়যন্ত্রের প্রমাণ নাই! কাজেই যখন তার দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের উত্তরে নিশিকান্ত বললে—দেখি। তখন দোকানদার বললে—না বাবুজী, আপনি বসুন—হামারা দেখছি।

আবার সেই কলের পুতুল বললে,—ঠিক হ্যায়।

যাক্ প্রাণ, থাক মান। নিশিকান্ত নিজেও অগত্যা ঘড়ি নির্ব্বাচন করলে।

দোকানদার বললে,—কই বাবু, গাড়ীমে বাই তো আছে না—বুড়া বাবুভি নাই।

তার ভগ্নীর পিতা। তার বাপ্, খুড়ো, মামা, মেসো—কেউ একজন। কাটা-ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিলে কি রকম যন্ত্রণা হয়, নিশিকান্ত রায় তা বুঝলো। তার গালে যেন ব্যথা বোধ করতে লাগ্‌লো—পাঁচটা চাঁপার কলি নিয়ে গড়া থাব্‌ড়ার আঘাত।

কিন্তু আর বেশী বিলম্বে কোন সুফল ফলবে না। অগত্যা ভাই-বোনের ঘড়ির মূল্য একুনে চারশো উনত্রিশ টাকা বারো আনা ঠাকুরলাল-হীরালালের দোকানে নগদ গুণে দিয়ে দাদাবাবু মুক্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষার চোখে দশ দিকে তাকালো। কিন্তু—হা দুরদৃষ্ট!

দোকানদার ভরসা করে ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। কিন্তু তার মনের নিভৃত নিকুঞ্জে সন্দেহের কাঁটা-লতা বেশ গজিয়ে উঠেছিল। দুর্গা শ্রীহরি বলে নিশিকান্তর গাড়ীর নম্বরটা সে টুকে রেখে দিল।

—বুদ্ধির দৌড়—

নির্ম্মলকান্ত দেখলে, উকীল মৃগাঙ্ক তার বাড়ীর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে একখানা মোটরে চড়ে চলে গেল। সে বুঝ্‌লো, মৃগাঙ্ক তাকে কোনো প্রকারে সেই বাড়ীতে দেখে সন্দেহ করেছে! টেলিভিসান তারই প্রেরিত দূত। সে দিন গাড়ীতে তার সঙ্গে অপর একজন লোকও ছিল।

নির্ম্মলকান্ত ঘরে গিয়ে অনেক কাগজ ছড়িয়ে বস্‌লো। দুটা চকোলেটের দানা মুখে দিলে। এক গেলাস বরফ-জল খেলে; নিজের

সঙ্গে কথা কইলে ; একটু হাসলো, বললে,—হ্যাঁ, গলাটা ভারি হয়েছে—স্বরটাও বদলেছে !

সে যা আশঙ্কা করেছিল, ঘটলো তাই। নদের চাঁদ দু'জন আগন্তুকের আগমন-সংবাদ দিলে। নির্ম্মলকান্ত একটা টানা থেকে গোটাসাতেক নোটের তাড়া বার করলে ; আকৃতি দেখলে মনে হয়, হাজার টাকার তাড়া ! প্রকৃতপক্ষে সেগুলার উপরে-নীচে এক একখানা দশ টাকার নোট ছিল !—মাঝে সাদা কাগজ।

গৃহে মৃগাঙ্ক প্রবেশ করলো ; তার সঙ্গে এলো জোড়াসাঁকো থানার ইন্‌স্পেক্টর। নির্ম্মল তাকে জানতো। সে জানতো না নির্ম্মলকান্তকে। তাদের অভ্যর্থনা করে মৃগাঙ্ক সোনার বিড়িদানের বিড়ি দিল—রূপার ডিবেয় পাণ দিল।

মৃগাঙ্ক নিজের পরিচয় দিল—ইন্‌স্পেক্টরের পরিচয় দিল, তার আত্মীয়।

—বেশ ! বেশ ! তা শুভাগমনের উদ্দেশ্য ?

মৃগাঙ্ক হকচকিয়ে গিয়েছিল। চেহারার সাদৃশ্য নাই—কণ্ঠস্বরও ভিন্ন ! তার উপর নোটের তাড়া—ঘরের সাজ-সজ্জা ! সে যে একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। কেবল ভদ্রতার খাতিরে মিঃ রায় তাদের সঙ্গে কথা কইছিল—তার মন পড়েছিল ঐ কাগজের গাদায়। সে এমন ভাব দেখালো ! মৃগাঙ্ক কি বলে ? তার ফুলের সুখ্যাত করলে। ফুল দেখেই তার গৃহে সে প্রবেশ করেছে !

মিঃ রায় হেসে নদেরচাঁদকে ডেকে কি বললে। তখনি দু'টা ফুলের তোড়া এলো। মৃগাঙ্ক আর পুলিসবাবু রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো।

নিশিকান্ত বললে—এরা বুদ্ধিমান! একজন ফৌজদারী কোর্টের উকীল, আর একজন শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক! এ ক্ষুদ্র শত্রু রাখা ঠিক নয়।

তখনি সেই জহুরীর দোকানের সুন্দরীর কথা তার স্মরণ-পথে উদিত হলো। তার নীচের কোটা থেকে অনুভূতি গুমরে উঠলো—বুদ্ধিতে কে ছোট, কে বড়—এ প্রশ্নের মীমাংসা নাই! মনের কোণে একটু গোলমাল ঘটেছে! এ গোলমাল বেড়ে না ওঠে! কিছু দিনের জন্য সে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করবে, সঙ্কল্প করলো।

—ঘূর্ণী-শিলা—

কাশ্মীর যাত্রার পথে নির্ম্মলকান্ত দিল্লীতে কিছুদিন বাস কর্ব্বার সঙ্কল্প জানালে তার এক বন্ধু প্রফেসারকে। নিশিকান্ত ছিল শঠ—কিন্তু নির্ম্মল-কান্ত বিদ্যোৎসাহী—সুষ্ঠু-সমাজে সমাদৃত। প্রফেসার অতি যত্নে তার বাসস্থান নির্দ্দেশ করলে দরিয়াগঞ্জের এক প্রাচীন অট্টালিকায়।

মিঃ রায় তার বিশ্বস্ত পাঠান মোটরচালক এবং মাত্র একটি অনুচর নিয়ে বড় বুইকে দিল্লী পৌছাল। বাসস্থান দেখে পরিতৃপ্ত হল। অট্টালিকা দিল্লীর প্রাচীন শাহজাহানাবাদ পরিখার উপর রক্ষিত। জানলা থেকে দেখা যায় লাল কেল্লার সেই অলিন্দ, যেখানে বসে বাদশাহ আর বেগমরা পরিখার পাদস্পর্শী যমুনার তরল তরঙ্গলীলা উপভোগ কর্ত্তেন। অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানে অনেক পুরাতন বৃক্ষও ছিল।

লাল তুম্বা

এখন আর ঠিক প্রাচীরের তলায় যমুনা বহে না। আর্য্য তাকে শ্রদ্ধা কর্ত্ত—মরুভূমির নিরস কঠোর মূর্ত্তি স্মরণ করে মোগলও যমুনার ঢল-ঢলে চপলতাকে আদর কর্ত্ত। এখন সে সোহাগ-গরিমার দীপ্তি তার নাই—তাই অভিমানে শাহজাহানাবাদ ছেড়ে প্রায় যমুনা এক মাইল দূরে চলে গেছে। তার চরে বড় বড় গাছ জন্মেছে—মাটির ওপর খেলে বেড়ায় শশক, তিতির, ময়ূর—গাছে বসে' কাকলী করে অসংখ্য পাখী।

দরিয়াগঞ্জের প্রভাত বড় মধুর। নির্ম্মলকান্ত জানলার ধারে বসে নানা কথা ভাবছিল দিল্লী পৌছাবার তিন দিন পরে। নীচে কাঠুরিয়ারা ইন্ধন আহরণ করছিল। তার পাশে বাগান, পোড়ো জমি—জীর্ণ ইমারতের ভগ্নস্তূপ। মাত্র শহরের প্রাচীরের উপর একটা দালানের মত ইমারত—সম্ভবতঃ ঘাট। যে ওম্‌রাহ বা রাজার সেটা বাসগৃহ ছিল—সেই স্থলে বসে সে যমুনা দেখবার ভান কর্ত্ত—আসল উদ্দেশ্য থাকৃত রাজ-দর্শনের। বাদশাহ সেদিকে তাকাচ্ছেন ভেবে বেচারা সপরিবারে ঘন ঘন কুর্ণিশ করত। মনে মনে সেচিত্র কল্পনা করে নির্ম্মলকান্ত হাসলে।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো কিন্তু সেই ভাঙ্গা অট্টালিকায়। ঊষার আলোর কোমল স্পর্শে একটা লাল দাড়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর তার মুখের পরে দৃষ্টি পড়লো নির্ম্মলকান্তের। আরে মোলো! এ মুখ-চোখ, হাব-ভাব তো সরফরাজ খাঁর। বেশ তো লাল দাড়ি গজিয়ে উঠেছে তার চিবুকের উপর।

সরফরাজ সুপুরুষ। দাড়ির প্রভায় তাকে সম্ভ্রান্ত দেখিয়েছে। চুড়িদার পায়জামা, কামদার টুপী আর মসলিনের লম্বা দিল্লী-পিরহান তাকে মানিয়েছিল ভাল। নিশিকান্ত ভাবলে সরফু মিঞার দাড়ির মত

লাল তুম্বা

অকস্মাৎ প্রত্নতত্ত্বে মতি গজিয়ে উঠ্‌লো কোন্ শুভক্ষণে। কারণ সে ভাঙ্গা ইটের মাঝে মাঝে সর্প-গতিতে বিচরণ ক'রে অন্তে সেই জীর্ণ ঘাটের মত কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে।

সরফরাজ খাঁ—সরফু কোকেনওয়ালারূপে বিগতকালে কলিকাতায় সাদা কালো অর্থাৎ কোকেন আফিম উভয় পদার্থের কারবার কর্ত্ত। কিন্তু সময়ে সময়ে তার মানসিক দীনতা কোকেন-ব্যবসায়ীদের মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক কর্ত্ত। কোকেন আফিম বিনা-শুল্কে আমদানী রপ্তানী করা এদের মতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চাতুরীর লড়াই। কিন্তু প্রবাদ ছিল, সরফু মিঞা চুরি জুয়া-চুরি এবং ডাকাতির মাল সাফাই দিত।

নিশিকান্ত যে চোর এবং প্রবঞ্চক—সেকথা জানতো মাত্র সে নিজে এবং দু'একজন নগণ্য সাঙ্গোপাঙ্গ। তাই যখন সাদা-কালোর কাজ কর্ত্ত তখন ব্যবসায়ীমহলে নিরশুবাবুর সম্ভ্রান্ততার খ্যাতি ছিল, আর সরফু—সে ছিল বিশিষ্ট সমাজে হেয়। কারণ চোরাই মাল সাফাই দেওয়ার গ্লানি—সরফুর নামের সঙ্গে মন্দ গন্ধের মত জড়িয়ে পড়েছিল স্মাগলার-মহলে।

পুলিসের সঙ্গে মাঝে সরফুর একবার মিত্রতা জন্মেছিল—যার ফলে অনেক কোকেনওয়ালা ধরা পড়েছিল। সরফু রাখ্‌তো দু' নৌকায় পা। গোয়েন্দারূপে পুলিসের কাছে সমব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সমাচার সরবরাহ কর্ত্ত—আর ভিতরে ভিতরে নিজে "কাজ" কর্ত্ত। সময়ে পুলিস এবং সাদা-কালোর ব্যবসায়ী উভয়ে তার শয়তানির বহরটা বিদিত হ'লো—যার ফলে তাকে পাত্তারি গুটিয়ে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ত্যাগ করে ভারতের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে হ'য়েছিল।

বিল্লিমারানমহল্লায় সরফরাজ খাঁ এখন ইমানদার লোক। সে

ফতেপুরী মসজিদে পাঁচবার নেমাজ পড়ত—সকাল-সন্ধ্যা ফকির দুঃখীকে কাবাব-রুটী দান করত। লোকে জানত সওদাগরি করে সে কলকাতা থেকে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে এনেছে।

এহেন সরফু মিঞা জীর্ণ-অট্টালিকায় প্রভাত-কিরণে ঝলসিত—নিশিকান্তর মনে কেমন খটকা লাগ্‌লো। পর্য্যবেক্ষণের ফলে সে দেখ্‌লে ফটকের অনতিদূরে একজন নিরীহ ব্যক্তি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—অথচ যেন নির্লিপ্ত। জীর্ণ-অট্টালিকার ভিতরের প্রক্রিয়া নিশিকান্ত দেখ্‌তে পেলে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে বাহিরে এলো সরফরাজ—যেন ঈষৎ ক্লান্ত। চকিতে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। নিশিকান্তর গৃহের প্রতি তাকালে। তারপর ভাঙা ইটের স্তূপের মাঝে মাঝে স্বচ্ছন্দ-জাত দু'টা একটা ফুল তুললে। গাছের আড়ালে আড়ালে প্রত্ন-তাত্বিক সরফরাজ ভগ্নগৃহ ত্যাগ করে রাজপথে বার হল।

পুরাতন দিল্লীর দরিয়াগঞ্জ খুব নির্জ্জন। কেহ তাকে দেখলে না—কারও দেখবার ভয়ও তার ছিল না। সে পথে বার হয়ে আর একবার এধার-ওধার তাকালে, তার পর চলে গেল। মিনিট দুই পরে ফটকের ধারের সেই পদ্মপত্রমিবাম্ভসা নিরীহ লোকটি দরিয়াগঞ্জের পথে বিপরীত দিকে উবে গেল।

ঠাকুরলাল হীরালালের দোকানে দাগা পেয়ে নিশিকান্ত স্থির করেছিল কুপথে আর চলবে না। সে অনেক লক্ষ টাকার অধিস্বামী; অর্থের সাধ তার মিটেছিল। সে নানাপ্রকার পুস্তক পাঠ ক'রে নিজের জ্ঞানও বাড়িয়েছিল। ভদ্রসমাজে ব্যবসাদার বলে নির্ম্মলকান্ত রায়ের খ্যাতি

দিন দিন বাড়ছিল। সে স্থির করেছিল—এবার সে প্রকাণ্ড একটা কারখানা নির্ম্মাণ করবে যেখানে বাঙালীর ছেলে প্রেম-শিল্পের শিক্ষা পাবে।

কিন্তু তার প্রখর মেধা আজকের সরফু-লীলা অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে কুণ্ঠা বোধ কর্লে। ভাঙা ফটকে পাহারা বসিয়ে নমাজী সরফু মোগলাই আসনে জীর্ণ কুঠীর মধ্যে চুপিসারে বিচরণ করে অতি ভোরে—প্রক্রিয়া অসাধারণ। নিশিকান্তের কুতূহল বেড়ে উঠ্‌লো প্রচণ্ড বেগে। চা ভাল লাগলো না—ডিমের প্রতি তাকালে সে বৈষ্ণব দৃষ্টিতে।

তার চিবুকে উঠলো একটা তিন-কোণা দাড়ি। একটা নীল আচকান পরিধান কর্লে নিশিকান্ত। মাথায় দিলে তরবুস্ টুপি পাঠানকে ফটকের বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত ক'রে নিশিকান্ত পোড়ো বাগানে প্রবেশ করলে। নির্জ্জন ভগ্নস্তূপে প্রভাতসূর্য্যের আলোকে রচা প্রাচীন বৃক্ষের ছায়া সাধারণ লোকের মনে আতঙ্কের লহর তোলে। তার উপর ছিল বসন্ত-গৌরীর একঘেয়ে শব্দ, ঘুঘুর ডাক, শহরের প্রথম জাগরণের অস্পষ্ট রব। কিন্তু গল্পের রাজপুত্র যেমন কানে তুলো গুঁজে ঈপ্সিতের সন্ধান কর্ত্তে গিয়েছিল নিশিকান্ত তেমনি দৃঢ়তা ও ধীরতার সঙ্গে প্রাণের চাঞ্চল্যকে দমন ক'রে জীর্ণ ঘাটে পৌঁছিল।

মোগলাই ধরণের কক্ষ—যমুনার দিকে একটা গবাক্ষ—মাত্র একটি প্রবেশপথ হাতীলতায় প্রায় বন্ধ। ঘরের মধ্যে বহু যুগের রাবিশ আর আবর্জ্জনা। এহেন কক্ষে সরফু মিঞা কোন্ কাজে নিযুক্ত ছিল—? একটা সমস্যা—যাকে কোনো জ্ঞানী লোক অবহেলা কর্ত্তে পারে না।

জানলা দিয়ে নিশিকান্ত দেখলে নীচের বাগানে বাবলা বনের

মাঝে মাঝে এক একটা ইউক্যালিপটাস যা তার নিজের গবাক্ষ দিয়ে দেখা যায়। দেওয়ালের প্রত্যেকটা পাথর নিশিকান্ত ঠুকে ঠুকে দেখ্‌লে তাদের পিছনে কোনো চোরা কুলুঙ্গী আছে কিনা। সে তদন্তের ফলে সে তার সমস্যার অন্তে পৌঁছাল না। সে তখন মেজের পাথরগুলা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। উত্তর দিকে রাবিশ কম—কেবল পাথরের ইট। নিশিকান্ত একে একে সেগুলাকে সরালে। তাদের নীচে ছিল একখানা পাথর চার ফুট চৌকা। একটা পাথর দিয়ে তাকে ঠুকল নিশিকান্ত—টপ টপে ফাঁপা জমির শব্দ। কিন্তু সে পাথর উঠে। কি প্রকারে?

নিশিকান্ত উত্তেজিত হয়েছিল—কিন্তু তাতেও তার সহজ ধীর ও রঙ্গপ্রিয় স্বভাব সজাগ ছিল।

সে নিজের মনে বল্লে—আরে ম'ল—একে খোলবার আবার একটা গুপ্তমন্ত্র চাই—চিচিঙ্‌ ফাঁক—চিচিঙ্‌ ফাঁক।

নিজের রসিকতায় সে নিজে হেসে উঠ্‌লো। তারপর পাথর খানাকে আরও ভাল করে দেখ্‌লে। তার চার ধারে যত পাথরের চাঙ্গড় ছিল সরালে। দেওয়ালের দিকে ঘেঁসে যেমনি দাঁড়ালে পাথরের সেদিকটা নেমে গেল। ভয়ে নিশিকান্ত একলাফে দক্ষিণ দিকে এলো। পাথর আবার বন্ধ হ'ল।

নিজের ভয়কে উপেক্ষা-করে নিশিকান্ত হাসলে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে সে উপলব্ধি করলে যে পাথরের এক দিক নেমে যায় অপর দিক ওঠে, নিশ্চয় তার মাঝখানটা পিন দিয়ে পাশের পাথরের সঙ্গে আট্‌কানো। সে এবার ধীরে ধীরে পাথরটাকে চাপলে দেওয়ালের দিক্‌ থেকে: পাথর

মাঝের পিনে ঘুরে গেল। তার দিক্ নামলো, দক্ষিণ দিক উঠ্‌লো। যখন পাথরের উপর নীচ সোজা হ'ল নিশিকান্ত দেখ্‌লে সিঁড়ি—কিন্তু সূচিভেদ্য অন্ধকার।

এবার নিশিকান্ত ভাবলে। অন্ধকারে কি আছে কে জানে? তার পর সে নেমে গেলে যদি পাথর বন্ধ হয়ে যায় ভিতর দিক্ থেকে খোলবার কি কৌশল তা তার জানা নাই। অবশ্য পাথরের মাঝখানে পিনের মুখে দুখানা পাথর আট্‌কে দিলে হয় কিন্তু যদি কেহ এসে পড়ে আর আটকাবার পাথর দুখানা খুলে দেয় তা হ'লে তার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির আধার—নশ্বর মানবদেহের হবে জীবন্ত সমাধি।

নিশিকান্ত স্মরণ করলে ইংরাজি প্রবচন—বিচারবুদ্ধি নির্ভীকতার প্রধান অঙ্গ। সে আবার ঘূর্ণী শিলার উপর পাথরের চাঙ্গড়গুলা চাপা দিলে।

সারাদিন সে নিজের জানলার অবসরের প্রতীক্ষায় বসে দিন কাটালে। রাখালেরা সেই ভাঙা কুঠীতে গরু ছাগল চরাতে এলো। গাছের শাখে শাখে পাখী ডাক্‌লো। রবিকরপ্রসূত গাছের ছায়া গাছদের প্রদক্ষিণ করলে। সারাদিন আর সে পথে নিশিকান্তর যাওয়া হ'ল না।

—ধাপ্পেল-গড়—

—ধাপ্পেল গড়?

—ধাপ্পেল গড়। ধাপ্পেল গড়ের রাণা সাহেব ওঁধের একজন প্রসিদ্ধ

তালুকদার। হিন্দুজাতি সংগঠন, প্রাথমিক-শিক্ষা-প্রচার-সমিতি প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান তাঁর প্রজাদের উন্নত করেছে।

—কিন্তু চুরি গেল কেমন করে ?

—কাগজে পড় নি ?

নির্ম্মলকান্তকে স্বীকার কর্ত্তে হ'ল যে ক'দিনের জন্য প্রবাসে এসে সে স্থানীয় সংবাদপত্র পড়ে নি। প্রফেসার সেন তাকে চুরির বিস্তারিত বিবরণ বল্লে।

রাণাসাহেব এসেছিলেন দিল্লীতে বড়লাট-সন্দর্শনে। রাণীসাহেব সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য পরিজন সহিত। পরশু রাত্রে রাণী গিয়েছিলেন বিজয়পুরের মহারাণীর ভোজে। গৃহে ফিরে তিনি হীরার মালা শয়ন-কক্ষে বাক্সের মধ্যে রেখেছিলেন। সকালে তাঁর একজন পরিচারিকাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।—তার সঙ্গে উধাও হ'য়েছিল হীরার সিঁথি।

এ বড় রহস্যের কথা। অত বড় লোক নিজের পরিচারিকা আনেন নি ?

—অনেকগুলা এনেছিলেন। এখানে এসে নূতন দাস-দাসী কতকগুলা রাখ্‌তে হয়েছিল ঘর-দ্বার সাফ কর্ব্বার জন্য।

নিশিকান্তের কুতূহল ক্রমশঃই বেড়ে উঠ্‌ছিল, হীরার মালার সঙ্গে সরফু মিঞার কোনো সম্বন্ধ থাক্‌লে—হীরার মালা তো তার হাতের ভিতর। যে দাসী পালিয়েছে তার সম্বন্ধে অনেক জেরা ক'রে নিশিকান্ত কোনো সমাচার বার করতে পারলে না।

বাল্য-বন্ধু নির্ম্মলকান্তের জানবার প্রকৃতি প্রফেসার সেনকে বিস্মিত কর্ল্লে।

সে বল্লে—শুনতে পাই তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেছ। তুমি কি গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছ নাকি?

নির্ম্মল হেসে বল্লে—কার্য্য কারণের সম্বন্ধ থেকে চুরির হেঁয়ালীর অর্থ করা মন্দ কি? মস্তিষ্ক খেলানো।

—মস্তিষ্ক খেলিয়েছে পুলিস অনেক। দিল্লীর অনেক লোককে সন্দেহ গ্রেপ্তার করেছে।

এ বিষয়ে আর কথাবার্ত্তা হল না।

রাত্রি তখন এগারটা। একটা কালো পোষাকে নিজেকে আবৃত করে—বিজলি বাতি, রিভলভার, ছড়ি, একশিশি কার্ব্বলিক এসিড প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে নিশিকান্ত ভাঙা কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করলে। তার ঔৎসুক্য, দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা দেখলে লোকের মনে পড়ে সেই কবির রচনা—'সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী' ইত্যাদি।

সে পাঠানের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। ঘূর্ণীশিলা অপসারিত হল। টর্চ্চের বিদ্যুৎ-আলোকে নিশিকান্ত দেখল পাথরের সিঁড়ি, চার ধাপের পর চাতাল। তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, যে ভাগ্যবান ওমরা হর সেটা ছিল বাসস্থান—তার পরিবারের মেয়েরা এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যমুনায় স্নান করতে যেত। সুড়ঙ্গে অনেক সিঁদুরের দাগ—প্রাসাদ ছিল নিশ্চয় কোনো হিন্দু ওম্‌রাহের।

নিশিকান্তের রসপ্রিয়তা লোপ পায়নি দারুণ উত্তেজনায়।

সে তার পাঠান-সঙ্গীকে বল্লে—সাবাস খাঁ, এমন সুরঙ্গে যদি সাপ না থেকে তারা চৌরঙ্গীতে বাস করে—আমি মোটেই তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে পারি না।

সাহাবাজ খাঁ অল্প কথার মানুষ। সে বল্লে—হুজুর।

নিশিকান্ত মুক্তহস্তে চারদিকে কার্ব্বলিক এসিড্ ছড়ালে। চাতালে নেমে দেখলে সিঁড়ি নেমে গেছে যমুনার দিকে। বহু ধাপ। তার সন্দেহ রইল না। সে বাইরের ভূমির নিম্নে। যমুনা-পুলিনে পলি পড়ে ঘাটে বার হবার দার বন্ধ হয়েছে। বাহিরের জমি খুঁজলে পাওয়া যাবে একটা ঘেরা স্নানের ঘাট যেখানে যমুনার জল আসতো আর স্নাতাদের পাপের কলঙ্ক ধুয়ে নিয়ে বয়ে যেত।

চারদিকে তাকালে নিশিকান্ত। পণ্ডশ্রম। সে উপরে উঠলো—আবার নীচে নামলো। তার কপালে শ্রমের চিহ্ন দেখা দিল—বিন্দু বিন্দু ঘামে। দ্বিতীয়বার উপরে উঠে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সাহাবাজ খাঁকে বল্লে—খাঁ সাহেব, ইংরাজিতে যাকে বলে বুনো হাঁস তাড়া—তাই হয়েছে। ওয়াহিদা মেহনত।

কম কথার মানুষ বল্লে—খোদা না খাস্তা।

কথাগুলা মন্ত্রশক্তির মত কাজ করলে। নিশিকান্তের মস্তিষ্কে প্রেরণা এলো। ঐশ্বর্য্যশালিনী অমাত্যবধূরা জলক্রীড়া করত অন্ততঃ কতকগুলা অলঙ্কার খুলে রেখে। নিশ্চয় চাতালের আশে পাশে একটা চোরা সিন্দুক পোঁতা আছে প্রাচীরের গায়ে।

সে প্রাচীরের গাত্র পরীক্ষা করলে। লাঠি দিয়ে শব্দ করলে। নিরেট পাথরের শব্দ।

শেষে নীচের চাতালে এক জায়গায় ফাঁপা শব্দ। পাথরের গায়ে একটা ছোট গর্ত্ত। তার মধ্যে লাঠির ডগা প্রবিষ্ট করে দিলে নিশিকান্ত। পাথরের কপাট খুলে গেল।

তার বিদ্যুৎ-বাতির আলোকে ঝলসিয়া উঠিল—খাপ্পেল গড়ের রাণীর হীরার-মালা।

তার সৌন্দর্য্য অপরিমেয়। আনন্দে নিশিকান্ত করতালি দিল।

—লুট নিয়া—

নিশিকান্ত জহরৎ চিনত। সে সুড়ঙ্গের অস্পষ্ট আলোকে টর্চ্চের সাহায্যে হীরার-মালার মূল্য নির্দ্ধারণ কর্লে—অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা।

হীরার-মালা যখন সে সযত্নে হাতে নিলে—হাস্যময়ী রহস্যময়ী এক যুবতীর মুখ তার স্মৃতি-পথে ভেসে এলো। এ মালা তার কণ্ঠে—

নিজেকে ভৎ র্সনা করলে নিশিকান্ত। কি সর্ব্বনাশ! সেই পবিত্র তরুণ কণ্ঠে এই চোরাই মাল—আর চোরাই মাল রাখার অপরাধে তার কারা-বাস! সর্ব্বনাশ!

নিশিকান্তের সহজ ধীরতা প্রত্যাবর্ত্তন কর্লে। সে হীরার মালা ভিতরের পকেটে রাখ্‌লে। তার পর গুপ্ত কুলঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ কর্লে। ছোটখাট অলঙ্কার অনেক ছিল সেখানে। আর নোটের তাড়া। হাজার টাকা, একশত টাকা, পঞ্চাশ টাকার নোটের তাড়া সে স্পর্শ করলে না। দশ টাকার নোটের কুড়িটা বাণ্ডিল আলখাল্লার বিভিন্নস্থানে রাখ্‌লে—যার মোট মূল্য—বিশ হাজার টাকা।

ঘূর্ণী শিলা যথাপূর্ব্ব বন্ধ ক'রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্লে নিশিকান্ত।

সে রাত্রে বাট্‌পারীর মাল একটা সামান্য মাটির কুঁজার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বাগানের এক কোণে মাটির তলায় পোঁতা রহিল।

সারা রাত নিশিকান্ত ভাবলে। হীরার-মালার হীরা খুলে বিক্রয় করতে গেলেও ঝঞ্ঝাট হ'তে পারে। বিশেষ যখন ধাপ্পেল গড়ের রাণা স্ত্রীকে ভালবাসে। সে মহত্ব তার শ্রেণীর লোকের চরিত্রে বিরল। আর ভদ্রলোক বিদ্যোৎসাহী—প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনে তার উৎসাহ আছে। বাস্—আর আধ্যাত্মিক তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

নিশিকান্ত যখন হ'ল আবার অতি প্রশান্ত—নিদ্রাদেবী তাকে তাঁর নিবিড় ক্রোড়ে টেনে নিলেন। সে স্বপ্ন দেখলে হাস্য-মুখী রাণী—গলায় হীরার-মালা—সোহাগভরে রাণাসাহেবকে বলছে—মার এই দয়ার জন্যে অনেক গরীবকে এক সঙ্গে বসে খাওয়াও—আমি নিজের হাতে রন্ধন করব। কিন্তু রাণীর মুখখানা সেই জহুরীর দোকানের তরুণীর উজ্জ্বল মুখ।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে যে সময় ধাপ্পেল গড়ের রাণাসাহেব অজ্ঞাত বন্ধুর প্রেরিত পার্শ্বেল খুলে দেখল হীরার-মালা মিঃ নির্ম্মলকান্ত রায় তখন আম্বালার হোটেলে। পার্শ্বেলের সঙ্গে এক পত্র ছিল—তাতে লেখা ছিল—

—যে দস্যুর রত্নাগার লুণ্ঠন করে এই মালা উদ্ধার করেছি—সে দস্যু এ অধীনের সন্ধান পেলে অধীনের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর চিহ্নমাত্র থাকবে না এ জগতে। তাই প্রকাশ্যে আপনার শ্রীকরে এ-মালা প্রত্যর্পণ কর্ত্তে পারলাম না। কেবল একটী অনুরোধ এই যে আপনি প্রজাহিতকর কাজ করে যাবেন, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। আর শ্রদ্ধেয়া

রাণীসাহেবাকে অনুরোধ কর্ব্বেন তিনি যেন দয়া করে নিজ হস্তে রন্ধন করে একদিন দরিদ্র নারায়ণের সেবা করেন।

রাজপ্রাসাদের ত্রিসীমায় এ সন্দেহ স্থান পেলে না যে এ রাম নাম ভূতের-কণ্ঠ-নিঃসৃত। সবাই ভাবলে সাধুর দান—সে হীরার মালা।

সন্দেহে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মাঝে ছিল মিঞা সরফুদ্দীন। অকস্মাৎ মুক্তি পেয়ে তার মন চঞ্চল হ'লো। সে সুড়ঙ্গের রত্নাগারের অবস্থা দেখে আলিবাবার দস্যু-সর্দ্দারের মত করুণ স্বরে গাহিল—লুট্ লিয়া শালা লুটলিয়া।

—সাহাবাজ খাঁ—

মাত্র দু'পেগ্ হুইস্কি পান ক'রে নির্ম্মলকান্তের মনোভাব উন্নত ও প্রফুল্ল হ'য়েছিল। সে সাহাবাজ খাঁকে ডেকে বল্লে—সাবাস্‌খাঁ তুম্ সাবাস্!

সে বল্লে—হুজুর।

—তুম্ বফাদার, ইমানদার বহুৎ সাবাস্।

সাহাবাজ খাঁ ঘাড় বেঁকিয়ে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রেখে বল্লে —ইন্‌সাল্লা।

নির্ম্মলকান্ত জেরা করে যতই তার জীবনের আদর্শের অনুসন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করলে—পাঠান-বীরের আন্তরিক বিনয় ততই তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে নিজেকে তুলে ধরলে চীনের প্রাচীরের মত। বহু কষ্টে চতুর

নির্ম্মলকান্ত বুঝলে সাহাবাজ খাঁর আন্তরিক বাসনা একটা মেওয়ার বাগিচার মালিক হ'বার।

—আচ্ছা একটা ফলন্ত-গাছ আছে এমন বাগানের কত দাম তোমার পেশোয়ারে ?

—হুজুর যেমন মাল তেমনি দাম।

—আচ্ছা মাসে একশত টাকা লাভ হয় এমন বাগানের কত দাম।

দশহাজার টাকার বাগান কিনে যদি একটা লোক সেখানে রীতিমত পরিশ্রম করে—আর যদি সীমান্ত থেকে পাঠানের-দল এসে লুটপাট না করে তা হ'লে অনায়াসে একশত টাকা উপার্জ্জন করা যায়।

—আচ্ছা সাবাস্ খাঁ, তুমি যদি দশহাজার টাকা পাও তা হ'লে অমনি একটা বাগিচা কেনো ?

সাবাস্ খাঁ মনে মনে হাসলে। যে পদার্থ পেটে পড়লে মানুষকে এমন প্রফুল্ল করে সরিয়ৎ কেন সেটাকে না-জায়েজ বলে বর্ণনা করেছে তা সে বুঝতে পারলে না। মন্দ কি ? সে নির্ম্মলকান্তকে আন্তরিক ভালবাসত।

তাকে মৌন দেখে নির্ম্মলকান্ত হাসলে। বল্লে—তুম্‌কো বাগিচা বনানে হোগা—সমঝা ?

মনিবের কথার প্রতিবাদ কর্ব্বার বে-আদবী সে জান্‌তো না।

বল্লে—যো হুকুম।

নির্ম্মল উঠে গেল। বিছানা খুলে একটা বালিশ বার করলে—ছুরি দিয়ে তাকে কাটলে।

তুলার ভিতর হতে দশ বাণ্ডিল নোট বাহির হ'ল যার মূল্য দশ হাজার টাকা।

সে টাকা সে সাবাস্ খাঁকে দিল। বল্লে—যতদিন বেঁচে থাক্‌ব সাবাস্ খাঁ বছরে বছরে এক টুকরি ফল পাঠিয়ে দিও। আর যদি আরও টাকার আবশ্যক হয় আমার কাছে চেয়ে নিও—লজ্জা করো না।

একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব হ'ল। সাবাস খাঁ নেবে না—তার গোলামী করবে—খিদ্‌মত করবে। নির্ম্মলকান্ত তাকে টাকা দেবেই—সে তার ভাই—তার অনুরাগ—তাব নম্রতা বড় মধুর।

সাবাসের চোখে জল এলো—অত বড় প্রকাণ্ড দেহ স্পন্দিত হ'তে লাগলো। সে নতজানু হ'য়ে নির্ম্মলকান্তের হস্ত চুম্বন কর্লে।

নির্ম্মল বল্লে—ইমানের পথে থেকো।

রেলগাড়ীতে সাহাবাজ খাঁ পেশোয়ার যাত্রা করলে—নির্ম্মলকান্তের বুইক ওয়াজিরাবাদ শিয়ালকোট হ'য়ে জাম্মু যাবার অভিপ্রায়ে লাহোরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

নির্ম্মলকান্ত বল্লে—একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারী। লোকটা কি বোঝেনি আমার চরিত্র! কে জানে? কিন্তু ভাবে বা ভাষায় কোনো দিন ঘুণাক্ষরে জান্‌তে দেয় নি যে সে আমার শয়তানি সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল ছিল।

—দস্যু—

উজীরাবাদ থেকে শিয়ালকোট অবধি বিস্তৃত প্রান্তর। পাঞ্জাবের

সমস্ত গ্রামের মত এ পথের গ্রামও একটু উঁচু জমির উপর কতকগুলা অসমান বিষদৃশ-দর্শন কোঠা-বাড়ীর সমষ্টি। দিনের আলোয় চক্ষু ঝলসে যায়—রাতে উপভোগ্য—শুক্‌নো হাওয়া। রাত্রি যত অধিক হয় বাতাস তত হয় শীতল।

শিয়ালকোটের সন্নিকটে সাঁরবিয়াল। গুজরাঁবালা থেকে একটা পথ এসে সেখানে মিশেছে। তার অনতিদূরে ক্ষুদ্র একটী নদী—চেনাবের পথে ধাবমান। তার পুলের দু'পাশে রাস্তা উচ্চ। গাড়ীতে নির্ম্মলকান্ত নিছক একেলা। তার গাড়ীর সামনে দুটা বড় আলো প্রচণ্ডভাবে জ্বল্‌ছিল। গাড়ী ছুটছিল উর্দ্ধশ্বাসে।

গতিতে একটা সুখ আছে। মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত বাতাস মানুষকে বিশ্বজয়ী করে। কল্পনা গাম্ভীর্য্য ধারণ করে। মিঃ রায় সে আনন্দ উপলব্ধি করছিল।

হঠাৎ গাড়ীর আলোয় দেখলে নির্ম্মলকান্ত দুটা লোক পুলের নীচে চলে গেল। এত রাত্রে এরকম প্রান্তরে মাথায় পাগড়ী-বাঁধা লোক—পথের মাঝে জম্বুকের মত নেমে গেল পুলের তলায়—এ ব্যাপারটা মোটেই তার ভাল লাগ্‌লো না। সে গাড়ীর বেগ-বাড়ানো পিন্ থেকে পা তুলে নিলে—গাড়ীর গতি মন্দ কর্‌লে—একটু নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লে।

একটা প্রকাণ্ড তালগাছের কাণ্ড পুলের পথ বন্ধ করে ভূ-লুণ্ঠিত। অন্য কেহ হ'লে গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে মাত্র সাত আট ক্রোশ প্রত্যাবর্ত্তন করে উজীরাবাদে রাত্রি-যাপন কর্ত্ত। নির্ম্মলকান্ত হাস্‌লে। গাড়ী একেবারে থামালে না।

পুলের প্রায় একশো গজ দূরে গাড়ী থামালে। গাড়ী থেকে নেমে তালগাছের গুঁড়ির কাছে গেল। প্রতিক্ষণে সে প্রত্যাশা করছিল—ই আলি—বলে ডাকাতের দল দু'পাশ দিয়ে উঠ্‌বে।

দস্যুরা ঠিক্ ভাবেনি—সাহেব গাড়ী থামিয়ে নিজে নেমে আসবে। তাদের বিশ্বাস ছিল গাড়ী ধাক্কা খেয়ে থেমে যাবে—বিস্মিত আরোহীদের উপর তখন তারা আক্রমণ করবে।

হাতে দু-নলা রিভলভার নিলে নির্ম্মলকান্ত। চুরট মুখে করে গাছের গুঁড়ির উপর বস্‌লো। পুলের তলায় দস্যুর দল বড় সমস্যায় পড়লো। গাড়ীর উজ্জ্বল আলো নির্ম্মলকান্তের মুখের উপর পড়ে তাকে অসাধারণ লাবণ্যময় করলে।

নির্ম্মলকান্ত সময় নষ্ট না ক'রে বল্লে—হিয়ার কোন্ হায়, আড্‌মি জল্‌দি আও। ওয়ারনা গুলি মারেগা। জল্‌দি।

নদী তো ক্ষীণতোয়া—বালির ওপর জলের স্রোত মাত্র। নির্ম্মলকান্ত শব্দ পেলে জলের ওপর দিয়ে মানুষ পার হওয়ার। সে আবার ডাক্‌লে! বাকি যারা ছিল তারা পার হয়ে ওপারে উঠে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। নির্ম্মলকান্ত মিছামিছি বন্দুকের একটা ফাঁকা শব্দ করে নিজের হাতে গাছের গুঁড়ি সরালে। তার পর গাড়ীতে উঠে শিয়ালকোট অভিমুখে যাত্রা করলে।

ধীরতাই ছিল তার সাফল্যের অন্তর্নিহিত শক্তি। বিপদ মানুষকে বিপন্ন করে কিন্তু সে নিজে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে পারে না। গুণ্ডা, বদমায়েস প্রভৃতির সঙ্গ ক'রে নির্ম্মলকান্ত বেশ বুঝেছিল তাদের মনোভাব। ভীরুতাই তাদের প্রধান বৃত্তি। চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ালে গুণ্ডা তার গুণ্ডামী

ছাড়ে। বল অপেক্ষা বুদ্ধি যখন নৈতিক জগতে বড় তখন তার বিধি-বিরোধ-ক্ষেত্রে এ নীতি যে সত্য তা সে উপলব্ধি করেছিল।

—রমজু হাঁজি—

কাশ্মীর ভ্রমণে এসে নিশিকান্ত মনে তেমন শান্তি পেলে না। ভূ-স্বর্গ তার প্রাণে স্বর্গ সুখ দিতে পারলো না—সেই যুবতীটির স্মৃতির অত্যাচারে। প্রথম স্মৃতিতে যুবতীর উপর নিশিকান্তর আক্রোশ হতো। আরও নানা রকম ভাব তার মনে আসতো—অনির্দ্দিষ্ট, এলোমেলো মিশ্র ভাব! কিন্তু স্থিতির শেষে আবিল-জল যেমন নির্ম্মল হয়—যত আবর্জ্জনা থিতিয়ে পড়ে পাত্রের নীচে—তার মনের অবস্থাও তেমনি হতো কিছুক্ষণের পর। আবিল চিন্তার পর নির্ম্মলতার মধ্যে ভেসে উঠ্‌তো সেই সুন্দর মুখ! আনন্দের লহরী! বুদ্ধি আর দুঃসাহসের অপূর্ব্ব সংযোগ। সে শুষ্ক ভাবকে মনের ত্রিসীমায় আসতে দিত না যে, সে ভদ্র-মহিলা—সমস্ত ব্যাপারটার তলে আছে এক প্রকাণ্ড ভ্রম! তা' হলে সে রমণী-রত্ন তার পক্ষে হতো দুর্লভ! মনের সঙ্গে ছলনা করেও নিজের কলুষিত জীবন-স্রোতে পবিত্র ভাগীরথীর জল সে মেশাতে পারবে না! সে অমরার দেবী—ত্রিদিবেই থাকবে! নিশিকান্ত ধরাতলে বসে তার পূজা করবে! আর যদি সে সম্ভ্রান্ত না হয়, তা হলে একদিন···

তার দিনের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল যখন বজরার হাঁজি একটি নক্‌সা-করা

কাঠের পাত্রে হুইস্কি এনে তার সাম্‌নে ধরলো। ধব্‌ধবে রুমালে তক্‌তকে কাঁচের গেলাস পরিষ্কার করে দিলে আর একবার হাঁজি রোমজান।

নিশিকান্ত বসেছিল কেয়ারী কুইন বজরার ছাদের উপর—চাঁদোয়ার নীচে। দাল হ্রদের জলে দিন-শেষের সূর্য্য-কিরণ তরল হয়ে এসে মিশেছিল—আর দূরে সেই জলে আত্মদান করছিল ক'জন মেম, সাঁতারের পোষাক পরে। তারা একটা বজরার উপর থেকে নানা ভঙ্গিতে জলে লাফ দিচ্ছিল—কখনও জলদেবীর মত, কখনও নিজেদের আকার সোয়ালো পাখীর লেজের মত করে। দূরে পাহাড়ের মাথার উপর হিমানী ঝলমল করছিল।

কাশ্মীরের হাঁজি ছিল নিশিকান্তর প্রিয়। সে ষোল আনা ঠক্‌, আট আনা চোর, সাড়ে পোনেরো আনা নোঙ্‌রা। কিন্তু তার সেবা বড় মধুর। তার হাতের কাছে যদি থাকে পরিষ্কার জল আর দূরে থাকে ময়লা পানীয় তো কষ্ট করে দূরে গিয়ে ময়লা-জল সে পান করে আসে। ষোড়শোপচারে সে তার বজরার অতিথিকে পূজা করে! এবং সুবিধা পেলেই তার বোতাম, সেফ্‌টি-পিন, টাকা-পয়সা, ফল বা আউন্স-কতক হুইস্কি চুরি করে। টাকা ভাঙ্গিয়ে আনতে দিলে সে তিন আনা নিজের পকেটে লুকিয়ে রাখে! ধরা পড়লে বলে,—হুজুর গলতি হুয়া, খোয়া গিয়া! হাম আপনা ঘরসে হুজুরকা নোকসান পূরা করতা। তার পর লুকানো তিন আনা বার করে দেয়।

নিশিকান্ত ভাব্‌তো, এমন কাশ্মীরী পণ্টন পেলে সে বিশ্ব-বিজয় কর্‌তে পারে! যদিও জনশ্রুতি বলে যে কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বাঙ্গালী নাবিক—পৈত্রিক স্বদেশে এদের প্রত্যাবর্ত্তনের কোনো লক্ষণ নিশিকান্তর নয়ন-পথে পড়েনি।

নিশিকান্ত বললে,—রমজু, আজ ডিনারের কি বন্দোবস্ত করেছ ?

—হুজুর, ডাক্ রোষ্ট, টমেটো স্যুপ, ক্রাম্ব চপ্, পুডিং।

—যাক্। তা হলে বোঝা গেল, ফাউল কাট্‌লেট, সাদা স্যুপ, মাটন কারী।

কারণ নিশিকান্ত জান্‌তো, পাঁচ মিনিট পরে যে-সব মিথ্যা ধরা পড়্‌বে, অভ্যাস খারাপ হবার ভয়ে হাঁজিরা সে সব বিষয়েও মিথ্যা বলতে ইতস্ততঃ করে না।

হাঁজি বল্লে,—হুজুর, সহরমে এক বড়া চোরী হো গিয়া। বহুৎ ঝঞ্ঝাট্ মাচা।

নিশিকান্ত বল্লে,—তোম্ বেটা একদম ঝুটা হায়। তুম যব্ বোলতা চুরি হুয়া, আলবৎ কোই খয়রাৎ কিয়া !

রোমজান হাসলো। বাঙ্গালী সাহেবরা নেহাৎ অপদার্থ নয় ! তাদের গুণগ্রাহিতা আছে, এ সত্য উপলব্ধি করে রোমজান খুশী হলো। কথা প্রমাণ করবার জন্য খানসামা গফুরকে সে ডাকলে,—গফুরওয়ো বোলাইয়োর !

গফুর বুল্‌লে, অর্থাৎ চলে এলো। রোমজানের আদেশে সে একখানা লাল কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপন আন্‌লে। এই গফুরকে রোমজান প্রথমে তার ভাইকা লাড়কা বলে পরিচয় দিয়েছিল, শেষে প্রমাণ হয় যে, সে তার স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র। নিশিকান্ত হাঁজি-চরিত্রের গভীরতায় যত ডুব দিত, ততই রত্ন উদ্ধার করতো, আর মনে মনে বেদনা অনুভব করতো যে, এমন চরিত্র কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য !

বিজ্ঞাপন অর্দ্ধেকটা উর্দ্দু ভাষায়, অর্দ্ধেকটা ইংরাজীতে। কোনো ইংরাজের নিজের মাতৃভাষার উপর এমন দখল ছিল না যে, সে

বিজ্ঞাপনের মর্ম্মোদ্ঘাটন করে! নিশিকান্ত কিন্তু বুঝলো ব্যাপারটা কি! বোখারার এক আমীর বক্‌রীদের সময় এক বহুমূল্য লাল-তুম্বা কোরবানী করবার মানৎ করেছিল। এক ফকীরের আদেশেই তার এই মানত। কোরবানী করবার হুকুম ছিল, শ্রীনগরের সা-হামাদান মস্‌জিদে। সিন-কিয়াঙ, ইয়ারকান্দী মহল্লায় আমীর শাহ বুলবুল্ লাল-তুম্বা নিয়ে বাস করছিল। বক্‌রীদের আর মাত্র দশদিন বাকী। অকস্মাৎ লাল-তুম্বা গায়েব! তার উপর আমীরের পুত্রের জীবন নির্ভর করছে—এবং পুত্রের জীবনের উপর নির্ভর করছে কাশঘরের আমীরী। কারণ, কাশঘরের আমীরের একমাত্র কন্যার সঙ্গে বোখারার এই আমীরের পুত্রের বিবাহ স্থির হয়েছে। লাল-তুম্বা হাজির কর্ত্তে পারলে আমীর পাঁচ হাজার টাকা বকশিস দেবে!

নিশিকান্ত চিন্তামগ্ন হলো। লাল-তুম্বা শ্বেত হস্তীর মত—বোধ হয় তারই জ্ঞাতি! দুনিয়ায় যদি জন্মায় তো শত বৎসরে একটা! পাঁচ হাজার টাকা বকশিস্! চাই এতে মস্তিষ্কের খেলা। বিদেশে একটা ডিটেক্‌টিভের কাজ করতে পারলে তার কীর্ত্তি অমর হয়ে থাকে!

তার দিনের স্বপন তার কল্পনার চোখের সামনে ধরলে সিন্ কিয়াং কাশগার, বোখারা ইয়ারকান্দ—সেখানে সে আমীরের অতিথি হয়ে রাজপথে পোলো খেলচে আর চামরী গরুর সদ্য-দোহা দুধ পান করছে।

—ফজলু—

মাঝি-মাল্লাদের মাঝে অন্য প্রসঙ্গ ছিল না। তাদের প্রাণের আন্তরিক

উত্তেজনা সুস্পষ্ট ফুটে উঠছিল তাদের বাক্যে। অহঙ্কার, প্ররোচনা, লোভের উত্তেজনা, দাল হ্রদের পড়ন্ত রোদের শোভা—সমস্ত মিলে নিশিকান্তকে লাল-হুম্বার তল্লাসীতে উৎসাহিত করে তুললো।

নিশিকান্ত স্থির-সিদ্ধান্ত করলে যে, লাল হুম্বা শ্রীনগরের ভিতর নাই, অথচ তার কাছাকাছি কোথাও আছে। সে নিজে মোটর চড়ে শ্রীনগরের চারিদিকে ঘুরে ঝিলাম-উপত্যকার ভূগোলটা আয়ত্ত করে ফেললে। একখানা শিকারা নিয়ে দাল-দরজা থেকে মার কেনালের ভিতর দিয়ে মিয়া কদল প্রভৃতি পুলের তলায় তলায় সমস্ত শ্রীনগরটা জল-পথে ভ্রমণ করলে। সহরের ভিড়ের মাঝে কেউ লাল-হুম্বা রাখবে না! শেষে শালিমার প্রমোদ-কাননের নিকট ক্ষুদ্র গ্রামটার উপর নিশিকান্তর সন্দেহ হলো। তার কারণ ছিল অনিবার্য্য।

কোকেনের কারবারে নিশিকান্তর এক পেশোয়ারী ছোকরা ছিল, তার নাম ফজলু। বাজারের মাংসে ফজলুর উদর-পূরণ হতো না। কর্ম্মাবসানে তার সখ ছিল ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মোরগ চুরি করা। সবাই বলতো, ফজলুর সম্মোহন-বিদ্যা আয়ত্ত আছে। ইচ্ছামত যে-কোনো জন্তুকে সে যাদু করতে পারে। ফজলু একবার বকশিসের লোভে আব-গারী দারোগাকে খবর দিয়ে প্রায় হাজার টাকার কোকেন ধরিয়ে দিয়েছিল। কোকেন-ব্যবসায়ীর নীচতার দায়ে ফজলু কলিকাতা-ত্যাগী হয়। একদিন শালিমারের কাছে অকস্মাৎ রমজু বললে—বাবুজী, হুজুর, একঠো আদমী আপ্‌কো দেখকে ছিপ্ গিয়া—পেশোয়ারী মালুম হোতা।

নিশিকান্তর চক্ষু এড়াবে, এমন সাধ্য ফজলুর ছিল না। তাকে দেখে-ছিল নিশিকান্ত—কিন্তু এত জোরে তার শিকারা দালের উপর দিয়ে

বেরিয়ে গেল যে, নিশিকান্ত তাদের অনুসরণ করতে পারলো না। রমজু লোকটাকে দেখেছিল। নিশিকান্ত তাকে পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিতে সম্মত হলো যদি সে ফজলুর সন্ধান করতে পারে! কেবল দুটো বিষয়ে নিশিকান্ত সন্দিহান হলো। প্রথমতঃ উপহারের বিজ্ঞাপন ফজলু দেখেছে কি না এবং দ্বিতীয়তঃ তার দারুণ বুভুক্ষা এড়িয়ে লাল-তুম্বা জীবিত আছে কি না!

তৃতীয় দিনে রমজু ফজলুর সন্ধান নিয়ে এলো। রমজু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। ফজলু বাঙ্গালী সাহেবের সঙ্গে সেদিন বেলা ৫'টার সময় নিষাদ-বাগে সাক্ষাৎ করতেও রাজী হয়েছে। তার সহৃদয় পুরাতন মনিব যখন তার উপর নারাজ নয়, তখন ফজলুর দ্বিধা ছিল না, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

নিষাদ-বাগে আপেল গাছের তলায় মাঠের উপর নিশিকান্ত একখানা বোখারা কার্পেটে বসে ফজলুর প্রতীক্ষা করছিল। বাগানের মালি এক চুবড়ি ফল উপঢৌকন দিয়েছিল তাকে। এমন সে দেয় সকল সম্ভ্রান্ত পরিব্রাজককে। নিশিকান্ত একটি মাত্র নাক্ আস্বাদন করেছিল। মিথ্যাবাদী ছাগল চোর ফজলুকে কি রকমে সে তার বেড়াজালে ফেলবে, সেই চিন্তায় সে তখন মশ্গুল।

ফজলু এসে বলতে লাগলো পুরানো অনেক কালের কথা; তার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে। পুলিসের শয়তানীর ফেরেবে পড়েই সে কৃতঘ্নতা করেছিল। এখন সে অনুতপ্ত।

অমায়িক হাসি হেসে নিশিকান্ত বললে—এখন বকরী চুরি বন্ধ করেছ তো?

ফজলু চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে দূরে মাত্র একটি ইংরাজ মহিলাকে দেখতে পেলে। ক্যাম্বিসের উপর তিনি পড়ন্ত রোদে দাল হ্রদের আলো ও ছায়ার প্রতিকৃতি প্রতিফলিত করছিলেন। ফজলু বললে—নিশুবাবু ওটা খস্‌লত। ওটা এ জিন্দেগীতে যাবে না।

আবার সেই বিহ্বল, উন্মাদক সরল অমায়িক হাসি! নিশিকান্ত বললে,—ফজলু, তোর ঐ ছাগল-ধরা বিদ্যেটা আমায় শিখিয়ে দিতে পারিস?

ফজলু উত্তর দিলে,—তোবা! তোবা! হুজুর কি করবেন সে এলেম নিয়ে! আপনি হুকুম দিলে ইন্‌শাল্লা যে বকরী বলবেন, এনে আপনাকে তার কাবাব খাওয়াবো।

—বাবা ফজলুদিন তুমি বড় হুনরমন্দ। তুমি জঙ্গলী বকরী ধরতে পারবে?

নিশিকান্তর পানে চেয়ে মনে মনে সে বললে—ফজলু-দিন!—হুঁ! নিশুবাবুর কিছু মতলব আছে। হুঁশিয়ার, ফজলু মিঞা!—এই অবধি স্বগতঃ।

তার পর প্রকাশ্যে বললে,—হুজুর, খোদার ফজলে আর ওস্তাদজীর মেহেরবাণীতে আমি পাহাড়ের টিব্বে থেকে মারখর ধরে আনতে পারি।

—বারশিঙ্গা?

—আলবৎ।

—বাঃ! দেখ ফজলু! আমার চাচা ফিচিঙ্‌পুরের রাজা, তুমি তো সব জানো!

তার পিতৃকুল, মাতৃকুলের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে—কেহ সে সংবাদ

বিদিত ছিল না। ফজলু অবাধে বললে,—তা আর জানি না—নিশুবাবু!

—চাচার সখ্ বড় ভীষণ। দেশ-বিদেশ থেকে জানোয়ার ধরে এক চিড়িয়াখানা বানাচ্ছেন। আরে বাপু খ্যাখো না, আমায় কি না চাচা বলেছে, কাশ্মীর থেকে একটা লাল দুম্বা নিয়ে যেতে।

কথা বলবার সময় নিশিকান্ত খুব মনোযোগ দিয়ে মিঞা ফজলুদীন খাঁর মুখের ভাব নিরীক্ষণ করছিল। লাল দুম্বার নামে ফজলুর মুখ ধারণ করেছিল গৌরবর্ণ।

সে একটু থতমত খেয়ে বললে,—লাল দুম্বা! না বাবু, দুম্বার রঙ্ কি লাল হয়?

• নিশিকান্ত ভাবলে, মাছ তো গেঁথেছি! এবার খেলিয়ে তুলি। কথা পাল্টে নিয়ে সে বললে—আরে, এত মেওয়া রয়েছে—খাও না। নাসপাতির সেরা হচ্ছে নাক্। খাও ফজলু।

ফজলু সেলাম করে বললে—মেহেরবাণী! কোমর থেকে একখানা ভীমদর্শন ছুরি বার করে সে নাক নাসপাতি কাটতে আরম্ভ করলে।

নিশিকান্ত বললে,—হ্যাঁ বলছিলাম—লাল দুম্বা। একেবারে লাল সুরখ্।

ফজল তার হাতে সেবের টুকরো দিয়ে বললে—না বাবু, দুম্বা কখনো লাল হয়?

—আরে এই তোমার এলেম! আমি সেদিন ইয়ারকান্দী মহল্লায় দেখলাম—

—ইয়ারকান্দী মহল্লা।—

ফজলুর রক্তের স্রোত শ্রাবণের দামোদরের ধারার মত তার মুখময় ছড়িয়ে পড়লো।

—হ্যাঁ। ইয়ারকান্দী মহল্লা। আহা, কি সুন্দর লাল রঙ!

ফজলু নিজের মনে আঙুলের চাপ দিয়ে কাগ্‌জি বাদাম ভাঙছিল; এক-মুখ আপেল—নিশিকান্ত বললে—যদি ঐ রকম একটা দুম্বা আমার চাচাজী পায় তো ভারি খুসী হয়।

ফজলু নিজের মনে বললে—ইয়ারকান্দী। ওঃ আল্লাহ্। ওরা বড় শোধ নেয়। শয়তান্।

এবার নিশিকান্ত হুইলে সুতা গুটোচ্ছিল, বললে—ইয়ারকান্দী মহল্লা থেকে কি আর আনতে বলছি। বলছিলাম, যদি লীদার নদীর ধারে জঙ্গলে—

—না বাবু, জঙ্গলে ও-রকম জানোয়ার পাওয়া যায় না।

নিশিকান্ত আবার সুতায় নোল দিলে। ফজলু অন্য কথা কইলে। কাশ্মীরীরা কাপুরুষ। এদের ইজ্জৎ নাই, ইজ্জৎ নাই—কাশ্মীরের সেব আর নাক খুব ভাল। এদের দেশে আঙুর হয় না—আঙুরের জন্য পেশোয়ার প্রসিদ্ধ।

শেষে ফজলু বিদায় চাইলে, বললে—কাল সকালে আপনার বোটে যাবো গাগ্‌রীবলে।

নিশিকান্ত বললে—লাল দুম্বা কিন্তু আমার চাই, ফজলু। চাচাজী খরচ করতে রাজী আছেন।

পথে শিকারার উপর নিশিকান্ত রমজুকে বল্লে—রমজু, তুম্ বেটা বহুৎ ঝুটা হ্যায়।

—আলবৎ হুজুর।

আলবৎ হুজুর। তার সৌজন্যের আতিশয্য নিশিকান্তকে উৎফুল্ল কর্‌লে। সে বললে—বাবা, সোজা কথা বল্‌ছি, শোনো। ঐ পেশোয়ারী আদমীটা কাল সকালে বোটে আসবে। ওর কাছে লাল-ডুম্বার কথা বলিস্‌ নে। বুঝ্‌লি? বখশিস্‌ পাবি।

—মাণিক চাঁদ—

মৃগাঙ্ক উকীলের কুৎসিত কৌতূহলকে দমন করবার ভার দিয়ে গিয়েছিল নিশিকান্ত—মাণিক চাঁদের উপর। তার বাপ-মার দেওয়া নাম রসিকলাল খাসনবীশ। কিন্তু তার চোখে ছিল বক্র দৃষ্টি। তাই বাল্যাবধি তার সহচরেরা তাকে বল্‌তো ট্যারা মাণিক। সে দু-একটা "কাজ" করে নিশিকান্তর আফিমের কাজে যোগ দিয়েছিল। তার মনে কষ্ট হবে বলে নিশিকান্ত তাকে বল্‌তো—মাণিকচাঁদ। নামটা তার বাপ-মার রাখা নামের স্থান অধিকার করেছিল। খাসনবীশ বদ্‌লে সে নিজের নামের শেষে বসিয়েছিল—চৌধুরী। দুটোয় মিলে হয়েছিল—মাণিকচাঁদ চৌধুরী।

উকীল বাবুর নিকট সে রাস্তার কণ্ট্রাক্‌টার ও অর্ডার সাপ্লায়ার মিঃ নির্ম্মলকান্ত রায়ের কর্ম্মচারী বলে পরিচয় দিলে। মাণিকচাঁদ এসে তাকে তার প্রভুর অভিবাদন জানালে। তার মনিবের সৌভাগ্যক্রমেই উকীল

বাবুর শুভাগমন হয়েছিল তাঁর কুটীরে। মৃগাঙ্ক তাকে মিষ্টভাষে তুষ্ট করে মোকদ্দমার বিবরণ জিজ্ঞাসা করলে।

—আজ্ঞে টিক্‌টিকি পুলিসের কাছে একটা দরখাস্ত কর্‌তে হবে। বাবুকে একজন ঠকিয়েছে।

জুয়াচোরের ক্রিয়া-কলাপের গল্প শুনে উকীলের ভাবান্তর হলো। তার প্রেরিত ভূষণ মণ্ডল মাঝে থেকে তিনশো টাকা উদরস্থ করবে, সে সন্দেহ তার ছিল না। কিন্তু টেলিভিসন, শেয়ার প্রভৃতি তো তারই শিক্ষা। সর্ব্বনাশ! যদি তার নাম প্রকাশ পায়, তা হলে তার যশ যে একেবারে মলিন হবে। যশই ওকালতীর মূল-ধন।

—সুচিন্ত্য দস্তিদার? হুঁ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নামটাও বিচিত্র।

অবশ্য নামকরণ ভূষণ মণ্ডল নিজেই করেছিল।

—কি রকম চেহারা?

ট্যারা মাণিক আলোক-চিত্র বার করে তার সাম্‌নে ধরলে. উকীল শিউরে উঠলো। অনেকে দু'চোখে যা দেখে, মাণিক দেড় চোখে তার চেয়ে বেশী দেখে। সে মনে মনে হাস্‌লো।

—আজ্ঞে, আমার বাবুর বিশ্বাস যে তার দলে অন্য লোক আছে। টিকটিকিতে দরখাস্ত দিলে তার দলের বাকী লোকগুলো ধরা পড়বে।

উকীল বললে,—হ্যাঁ! বড় মুস্কিল। কি জানেন, এক তো এগার লক্ষ লোকের ভিতর থেকে তাকে খুঁজে বার করা। তারপর—তারপর—

—পুলিশ সব পারে। আর আপনার মত উকীলের সাহায্যে কি না হতে পারে?

—আচ্ছা! আপনার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে হবে। তাঁকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়।

—আজ্ঞে, বাবু পশ্চিমে গেছেন।

মৃগাঙ্ক অকূল পাথারে একখানা জেলে-ডিঙ্গি দেখ্‌তে পেলে। উপস্থিত সে তারই সাহচর্য্যে প্রাণ বাঁচালো।

সেদিন কোর্টে তার জেরার তেমন জোর হলো না। সওয়াল-জবাবও কেমন খাপ ছাড়া! দুজন বিপক্ষ দলের উকীলকে মন্দ কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হলো।

সন্ধ্যার পর মুহুরি বেচারাম দালাল ভূষণ মণ্ডলকে ডেকে নিয়ে এলো।

ভূষণের লজ্জা নাই। বললে—লোকটা দেখলাম সোঁদর-গাধা! তিন তিন শো টাকা কি ছাড়া যায়?

—জেলে যাও। আর আমার বদনাম!

—মিটিয়ে ফেললেই হবে। হাতে-পায়ে ধরে কিছু টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলবো।

মৃগাঙ্ক তাকে যারপরনাই গালাগাল দিল। বুঝলো, তার ঘর থেকেও কিছু টাকা যাবে নিষ্পত্তির সময়।

ভবিষ্যতে সে আর দালালের মারফত কোনো কাজ করবে না—মনে মনে ঠিক করলে।

কুক্ষণে তার ঘরে জুয়াচোর ঢুকেছিল। কিন্তু আত্ম-গ্লানির সময় তার

মনে রইলো না যে, জুয়াচোরের পায়ের ধূলা তার বাড়ীতে পড়ে বলেই তার যা' কিছু সমৃদ্ধি !

—মিস্ পারুল—

নিশিকান্ত নিজের উপর খুব খুশী ছিল। ফজলু পেশোয়ারী যে লাল-চুম্বা-হরণের রাবণ, সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার বিজয়-উৎসবের প্রাক্কালেই আজকাল তাকে মলিন করতো সেই তরুণীর স্মৃতি ! বিশ্ববিজয়ী জুয়াচোর নিশিকান্ত চোখে চশমা-আঁটা একটা মেয়ের কাছে পরাজিত ! এই চিন্তাই তার পক্ষে যেন বিভীষিকা !

কিন্তু প্রকৃত কথা জান্‌লে নিশিকান্তকে এতখানি আত্মগ্লানির কশাঘাত সহ্য করতে হতো না। জগতে প্রবঞ্চনার পথ ছাড়া যে অন্য পথও আছে, সে কথার ক্ষীণ আভাস মাঝে মাঝে তার কাণে বাজতো। কিন্তু সে মলিন অব্যক্ত স্বরে শুন্‌তো বিজিতের আর্ত্তনাদ—যারা ঠকেছে, তাদের কাতর অনুশোচনা ; চুরি হয়েছে যাদের সম্পত্তি, তাদের ব্যথার ক্রন্দন ! বিজেতার পথ প্রবঞ্চনার পথ, লুণ্ঠনকারীর পথ ডাকাতের পথ। আর নিশিকান্ত জান্‌তো, সেইটাই জীবনের রাজ-পথ। সুতরাং মিস্ পারুল রায় তাকে সজীবতার উৎসবে ডুবিয়ে দিয়ে যখন চেঙ্গিস খাঁর মত তার ঘড়ী নিয়ে বিজয়-কেতন উড়িয়ে চলে গেল, তখন নিশিকান্ত ভাবতে পারলো না যে, যুবতীটি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা কুমারী !

আসল কথা, সেই রাত্রেই কুমারী পারুল রায়, বি-এ, তার পিতা

রেঙুনের ব্যারিষ্টার মিঃ শৈলেন রায়ের সঙ্গে বিলাতে পূজার ছুটী উপভোগ করতে যাচ্ছিল। এক দিন পূর্ব্বে তারা কলিকাতায় পৌছায়। তাড়াতাড়ি ছু'চারটে বাজার সারছিল। সেই তাড়াতাড়ির মাঝেই পারুল সিনেমায় আফ্রিকার জঙ্গলের ছায়াচিত্র দেখে নিয়েছিল। নূতন দেশে যাবে, কত নূতন শিক্ষা পাবে—এই আনন্দের লহরে পারুলের মন তখন ভেসে চলেছে। তার পিতা টমাস কুকের অফিসে যখন কাজের কথা কইছে—পারুল সময় বাঁচাবার জন্য তখন ঢুকেছিল পাশে ঠাকুরলালের দোকানে হাত-ঘড়ী পছন্দ করতে।

দাদাবাবু-লাভের নূতন আনন্দে পারুল আরও সময় বাঁচাবার জন্য ছুটে পিতার নিকটে গেল।

. রায় মহাশয় হেসে বললেন,—কি রে, ঘড়ী নিয়ে এলি। টাকা কোথায় পেলি?

পারুল হেসে বললে,—দাম দিইনি, বাবা। আপনি দেবেন চলুন।

মিঃ রায় বল্লেন—খুব বাহাদুর মেয়ে তো। তোকে তারা চেনে না, শোনে না, তোর হাতে ঘড়ী ছেড়ে দিলে?

এবার হাসতে হাসতে পারুলের মুখ-চোখ সিঁদুরবর্ণ ধারণ করলে। সে বললে,—দাদাবাবুকে জামিন রেখে এসেছি, বাবা। দাদাবুকে চেনেন না?

পিতা বল্লেন—আস্ত পাগল। আচ্ছা, অপেক্ষা কর্।

মিঃ রায় সমস্ত য়ুরোপ ঘুরবেন—তার সুবিধার সকল ব্যবস্থাই করছিলেন টমাস্ কুকের সঙ্গে। তাঁর প্রায় আরও আধ ঘণ্টা সময় লাগলো। পারুল হাত-ঘড়ীটাকে নিজের কোমল মণিবন্ধে বেঁধে এক

একবার দেখছিল জাহাজের ছবি, আর এক একবার অপাঙ্গে দেখছিল নিজের মণিবন্ধ কেমন দেখায়—তাকে নূতন সজীব ভূষণে বিভূষিত করে'। যখন তার পিতার কাজ চুকলো, সাহেব বল্লে—মিস্ রায়, অতি সুন্দর ঘড়ী আপনি কিনেছেন! আর আপনার স্ফূর্ত্তি দেখে আমার নিজের যৌবন যেন ফিরে আসছে, মনে হচ্ছে!

পারুল তাকে ধন্যবাদ দিল।

সাহেব বললে,—ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করো মিস্। সত্য কথা বল্‌বো, আমি কাজের মানুষ। ভাবপ্রবণ নই। কিন্তু আজ তোমার আনন্দাতিশয্য আমাকে আমার নিজের মেয়ের জন্য কাতর করছে।

পারুলের মুখ লাল হলো। সে বললে,—আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।

সাহেব তাকে ঠিকানা দিল। তারা চলে গেলে জোর করে মনের ঘাড় ধরে তাকে কন্যার চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে হিসাবের খাতার উপর ফেললে।

রায় ও পারুল ঠাকুরলালের দোকানে গিয়ে ঘড়ীর দামের কথা জিজ্ঞাসা করলে। পিতা চেকের বহি বার করে লিখতে উদ্যত হলো।

দোকানদার বললে,—দাম তো বাবু দিয়ে গেছেন।

—বাবু দিয়ে গেছেন? কোন্ বাবু?

—দাদাবাবু।

এক মুখ হেসে পারুল বল্লে—দাদাবাবু!

মিঃ রায় বিরক্ত হয়ে বললেন—তোদের রসিকতা আমার মোটে পছন্দ হয় না। কে দাদাবাবু? কি ব্যাপার?

পারুল বল্লে—আমি যখন ঘড়ি পছন্দ করছিলাম, দোকানে একজন লোক ছিল। সে আমাকে এই ঘড়ীটা দেখিয়ে দিলে। পরিচয় নেই, ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্র লোকের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন—আমি ভাবলাম, তিনি দোকানদার! তারপর এঁরা যখন বেরিয়ে এলেন, তখন বুঝলাম, একটা নির্ব্বোধ ব্যস্তবাগীশ। এঁরা মনে করলেন, তিনি আমার দাদাবাবু। আমিও তাঁকে বাঁধা দিয়ে আপনাকে ঘড়ী দেখাতে গেলাম। কত রকমের গাধা যে জগতে থাকে!

পারুলের হাসি শৈলেন রায়ের মোটেই ভাল লাগলো না। সে বুঝলে, একটা বে-আদব জানোয়ার সস্তায় বদান্যতা দেখিয়ে তার কন্যার সঙ্গে পরিচিত হবার উচ্চাশা পোষণ করছে তার গর্দ্দভ-চিত্তে! সেই রাত্রেই কলিকাতা ত্যাগ করতে না হলে সে তার চাবুকের সদ্ব্যবহার করতো গর্দ্দভটার পৃষ্ঠে!

—কোন্ হায় ও আদ্‌মী?

—আমরা কি জানবো, বাবু সাহেব! আমরা জানি, আপনাদের লোক!

—ভগবান অমন মানুষের হাত থেকে রক্ষা করুন। সে গাধা!

পারুল বললে,—বাবা, দাদাবাবু তো তার বোকামির মূল্য দিয়েছে। চলুন যাই।

মিঃ রায় বললেন—না পারুল। ব্যাপারটা হেসে ওড়াবার মত নয়। পুলিশে খবর দিতে হবে।

দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলে,—তার নাম-ধাম কিছু দিতে পারেন?

চতুর ব্যবসাদার সে কথাটুকু বললে না যে, তারা উভয়কেই সন্দেহ

করেছিল। দোকানদার বললে—বাবুসাহেব, আমাদের সুবে হয়েছিল। কিন্তু গাহক আদমী, নাম তো জিজ্ঞাসা করতে পারি না। গাড়ীর নম্বর টুকে রেখেছি।

—আঃ! তা হলেই হবে। আমি এই চেক্ আর তার বে-আদবীর গল্প পুলিশ-কমিশনারের কাছে লিখে রেখে যাচ্ছি।

—সন্ধান—

বক্‌রীদের মাত্র তখন তিন দিন বাকী। ফজলু এক একবার টোপ গেলে, এক একবার ওগ্‌রায়। এদিকে সেদিন প্রভাতে নিশিকান্তকে রমজু আর একখানা ইস্তাহার দিল। ভাগ্যক্রমে সেখানা লেখা ছিল ইংরাজীতে। পারিতোষিকের টাকার মাত্রা তাতে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নিশিকান্ত ভাবলে, আর খেলালে চলবে না। হাজার টাকা দিলেও মবলগ পাঁচ হাজার টাকা লাভ থাকবে। তার কাশ্মীর-ভ্রমণের খরচ উঠে যাবে।

ফজলু যখন এলো, নিশিকান্ত কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বললে—তুমি আমার সঙ্গে চালাকী করচো, ফজলু! আমার মামুর একটা সখের জিনিষ এনে দেবে—আর তুমি কি না চিংড়িমাছ বেচার মত দর সুরু করলে!

ফজলু সবিনয়ে নিবেদন করলে যে, তার নিজের জানটা যদি হুজুরের

কোন কাজে লাগে—ফজলুর জান সেজন্য প্রস্তুত— আত্মবলির যূপকাষ্ঠের ধারে। যদি রাজা বাহাদুর ফজলুকে একটা খাঁচার ভিতর রেখে তিলমাত্র সুখ পান তো ফজলু অবলীলাক্রমে পিঞ্জরাবদ্ধ হতে পারে এবং আবশ্যক হলে শিক্ষিত বনমানুষের মত চুরুট খেতে, হুইস্কি পান করতে, খানা-পোষাক পরে কাঁটা-চামচ ধরে ডিনার খেতেও প্রস্তুত আছে।

নিশিকান্ত বললে—ছাখো ফজলু, এ-সব মামুলী কথা। হ্যাঁ, আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে, তা আমি জানি। কিন্তু, আজকের মধ্যে যদি লাল ডুম্বা পাই তো ভালো। আমি ৬০০৲ থেকে ৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করতে রাজি। না হয়—ব্যস্, এই শেষ।

—আজকের মধ্যে হয় না, হুজুর।

—ব্যস্! দোসরা কথা বলো। কেন হয় না—কেন?

—আমার মাত্র একশত টাকা আছে, হুজুর। আর যে বদ্‌বখ্‌তের কাছে লাল ডুম্বা আছে, সে চায় এগারোশো টাকা। হুজুর দেবেন আটশো। আমাকে দুশো টাকার জোগাড় করতে হবে। সামনে ঈদ্। ঈদের পর আমি জোগাড় করবো। হুজুর তো এখন আছেন?

নিশিকান্ত বুঝলো, ফজলু পুরোপুরি হাজার টাকাই নেবে। বোধ হয়, সে উপহারের কথা জানে। ধরা পড়বার ভয়ে নিজে মেষ নিয়ে ইয়ারকান্দী মহল্লায় যেতে নারাজ।

নিশিকান্ত দু'পেগ হুইস্কি টানলো। মাথাটা তাতে পরিষ্কার হলো। কিন্তু প্রভাতের কুয়াশা যেমন পাহাড়ের ধারে ঝুলে থাকে, একটা ঝাপ্‌সা অনির্দ্দিষ্ট ভাব তার মস্তিষ্কে তখনও দোদুল্যমান ছিল। তৃতীয় পেগের পর তার বুদ্ধি মার্জ্জিত হলো।

নিজের মোটরে বসিয়ে ফজলুকে নিয়ে সে চললো তখত-ই-সুলেমানের পাদদেশ প্রদক্ষিণ করে। অনিবার্য্য কারণ—যে পর্য্যন্ত না সে নিজে নবাবের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে মেষ প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারে, দুম্বাকে লুকিয়ে থাকতে হবে বজরার খোলে—রমজুর জিম্মায়। জাফরাণ-ক্ষেত্র পার হয়ে গাড়ী ইসলামাবাদের দিকে গেল না, বামে চললো শালিমারের দিকে।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র বড় গর্ব্বেই সিংহাসনাধিরূঢ় আছে। এক আধ টুকরো শাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে উজ্জ্বল নীল আকাশের কোলে। চাঁদের শীকরমধ্যে হিমালয়ের বরফের চাঙ্গড়-গুলো হাসছিল—প্রাণ-ভরে'। যখন জ্যোৎস্নায় একটা পাহাড়ের ধারে ফজলু লাল দুম্বা এনে নিশিকান্তর সামনে ধরলে, তখন নিশিকান্ত বুঝলে; নবাব কেন পাঁচ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়ে এই ভেড়াটাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিল। হাঁ, গঙ্গাকে যদি পূজা করতে হয় তো গঙ্গাজলই শ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ! সুন্দরের পূজা করতে হলে সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

—লাল দুম্বা—

টকটকে সিঁদুরবর্ণ মেষ—মযমযে কালো শিং—তার গলায় নীল কাচের মালা। দুম্বার লাল অঙ্গে চাঁদের কিরণ পড়েছিল—তাকে ঔজ্জ্বল্যে স্নাত করছিল চাঁদ!

লাল ডুম্বা

ফজলু বললে—লাল ডুম্বা, বেটা মেরা, দোস্ত হামারা—সেলাম করো মেরা মালিককো।

লাল ডুম্বা নতজানু হয়ে নিশিকান্তকে অভিবাদন করলে। নিশিকান্ত কোলে তুলে নিয়ে তার কোমল পশমের উষ্ণতায় আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো। কৃতজ্ঞ মেষ ব্যাং-ব্যাং ক'রে তার স্নেহের প্রতিদান দিল।

সারা রাত লাল ডুম্বা বজরার প্রকোষ্ঠে নিশিকান্তর খাটিয়ার পাশে শুয়ে রইল। প্রথম প্রহরে সে বিছানার চাদরের এক কোণ আহার করে দন্ত-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করলো। দ্বিতীয় প্রহরে সে নিশিকান্তর মোজার গোড়ালী উদরস্থ করলে—তাতে তেমন সুখ পেলে না। তৃতীয় প্রহরে খবরের কাগজ এবং ভোর রাত্রে তার নিজের জন্য প্রতিশ্রুত পারিতোষিকের বিজ্ঞাপন ভক্ষণ করার পরে রমজু-দত্তর ভিজে ছোলা, ডাল-রুটি, আখরোট গাছের পাতা আর চেনাবের কচি ডাল ভোজন ক'রে বাবুর্চীখানা বজরার তক্তার নীচে প্রবেশ করলো। পাছে শব্দ করে, সেই ভয়ে রমজু তিন সেরের দাম নিয়ে এক সের ভুশি তার মুখের কাছে রাখলো।

—ইয়ারকান্দী মহল্লা—

সকালে সু-সজ্জিত নিশিকান্ত ইয়ারকান্দী মহল্লার বাহিরে মোটর রেখে গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। অসংখ্য রন্ধনশালা থেকে ভেড়ার চর্বির গন্ধ ক্রমে তাকে অভিভূত করলো। আকবর বাদশাহের আমলের পাকা

রাস্তার দু'পাশ থেকে তাদের প্রাচীন গন্ধ আরও বাইশ রকম গন্ধের সঙ্গে মিশে বেচারা নিশিকান্তকে কাবু করলো। তার উপর ধোঁয়া—উইলো কাঠের ধোঁয়া, খড়ের ধোঁয়া, বজরা-ভাঙ্গা কাঠের ধোঁয়া, আখরোট-কাঠের কুচার ধোঁয়া তাকে অন্ধ করলো। সে এ-গলি ও-গলি ঘুরে নবাব-বাড়ীর কোনও সন্ধান পেলে না। মেষ-পোষক বিমর্ষ কোন মোগল-পরিবার তার দৃষ্টিপথে পড়লো না। তবে কি—?

তার মাথা ঘুরছিল—গন্ধে, ধোঁয়ার স্পর্শে, রাক্ষুসে কাশ্মীরীদের অর্থহীন চীৎকারে শব্দে, কর্দ্দমের রসে, কদর্য্য পুরাতন কাঠের বাড়ীর রূপে। সবার চেয়ে পীড়াদায়ক হলো অনুভূতি—নিজের অসারতার অনুভূতি, নিজের বোকামির অনুভূতি!

মানুষ শেষ অবধি আশা ছাড়ে না! দুঃসাহসে নির্ভর করে নিশিকান্ত বোখারার এক কার্পেট-ব্যবসায়ীর গদিতে গেল। দু' একখানা গালিচা দেখে সে নবাবের সংবাদ নেবার চেষ্টা করলে।

সওদাগর বললে—বাবুজী, আমাদের দেশ গরীবের দেশ। সিন-কিয়াঙে পয়সা নাই। আমাদের শিল্প আছে, দেশ ভ্রমণের সখ আছে, তাই ঘুরে বেড়াই। কিন্তু দেশে পয়সা নাই।

তার সঙ্গে অনেক বাক্যালাপ ক'রে নিশিকান্ত বুঝলো সোভিয়েট তুর্কীস্থানে একটু লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিয়েছে—চীনা-তুর্কীস্থান মরুভূমি!

কারাকোরামের একটা চাঙ্গড়া পড়ে সমস্ত তুর্কীস্থান গুঁড়া হলেও নিশিকান্তর কিছু এসে যায় না। সে অকস্মাৎ সিন্-কিয়াঙের প্রাণি-তত্ত্বে আগ্রহ দেখালে।

সে বললে—আপনাদের দেশে ইয়াক আছে?

—হাঁ। ইয়াক আমাদের ভাই।

—হুম্বা ?

—হ্যাঁ, হুম্বা আমাদের খাদ্য। আঃ! কাশ্মীরের ভেড়া আবার ভেড়া নাকি! ওঃ!

—অনেক রঙেরও হয় হুম্বা ?

—হাঁ, থোড়া বহুৎ।

—লাল হুম্বা ?

ইয়ারকান্দী হাসলে, হেসে বললে,—হুম্বা কভি লাল হোতা ? হাঁ, হাম্লোক মজাসে পশমকো রাঙা তা সুরয্—লাল।

সে কতকগুলা গালিচার লাল রঙ দেখালে নিশিকান্তকে। কাশ্মীরের শীতেও তার কপালে দু' ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। বদ্মায়েস ফজলু একটা সাদা ভেড়াকে রাঙিয়ে রমজুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তার কাছ থেকে হাজার টাকা বার করে নিয়েছে!

নিশিকান্ত বজরায় এসে একেবারে উপরের সামিয়ানার নীচে বস্লো। খানসামা শিশু কাঠের ট্রেতে একখানা বড় চিঠি এনে দিলে। নিশিকান্তর ইচ্ছা হচ্ছিল, এক লাথি মেরে ছেলেটাকে মীর-খালের জলে ফেলে দেয়।

চিঠিখানা কলিকাতার পুলিশ-কমিশনরের অফিস থেকে তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে পাঠানো হয়েছিল। বিশ্বাসী ভৃত্য নদেরচাঁদ চিঠিখানা কাশ্মীরে পাঠিয়েছে। অপরাধী যত বড় সাহসী হোক না কেন, পুলিশের নামে প্রথমে তাদের বুক একটু কেঁপে ওঠে! তার উপর বিদেশে তার নামে চিঠি—পুলিশ-কমিশনরের!· এ সম্মান সে দেশেও পায়নি! চিঠি পড়ে একসঙ্গে অনেকগুলা ভাব নিশিকান্তর মনে এলো। সে লক্ষ্য করেনি—ধীরে ধীরে রমজু এসে তার সামনের টেবিলে মদের বোতল, সোডা-পানি আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাঁচের গ্লাস রেখেছিল।

পত্রে লেখা ছিল যে, মিঃ এস্ রায় ব্যারিষ্টার তার জন্য তিনশো দশ টাকার একখানা চেক্ পুলিশ কমিশনরের নিকট জমা রেখে গেছে— আর তার নামে অশিষ্টতার নালিশ করেছে। চিঠির সঙ্গে রায় সাহেবের নালিশ সংলগ্ন ছিল। সে যদি তার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ দিতে না পারে তো পুলিশ তার নামে নালিশ রুজু করবে।

নিশিকান্ত বার বার দু-বার পড়লে চিঠিখানা। চিঠিখানা পড়ে সে আনন্দিত হলো। তার আত্ম-সম্মান ফিরে এলো! দুঃখিত হলো, জীবনে আর পারুলের ত্রি-সীমায় ঘেঁষতে পারবে না! কারণ, সে তার জগতের বাহিরে। পুলিশ কমিশনরের ধমকে তার হাসি এলো। সে সমুদ্রে বাস করে। শিশিরে তার কিসের ভয়? তখনই সে চিঠির জবাব দিলে। সে নিজে রায়—মিস পারুলও রায়। সে তাকে তার প্রবাসী জ্ঞাতি-ভগ্নী বলে মনে করেছিল। বিশেষ, কুমারী যখন তাকে দাদাবাবু বলে ডাকলো সে নিজের ভুলের জন্য এবং মিঃ শৈলেন রায়ের কৃতজ্ঞতার অভাবের জন্য

দুঃখিত। সে এখন কাশ্মীরে! পুলিশ যেন চেক্‌খানা দয়া করে তার নামে লয়েডস্ ব্যাঙ্কে জমা দেয়।

—ভ্যাবাকান্ত—

তার পর তার মনে জাগলো আশা! লাল ডুম্বার ব্যাপারটাও যে তার আত্মমর্য্যাদার পক্ষে হানিকর কে তা বল্‌তে পারে? সে রমজুকে বললে,—ডুম্বা কাঁহা?

—কিচিন বোটমে।

—ইয়াবকান্দী নবাব কাঁহা?

—খোদা মালুম। গরীব আদমী ক্যায়সা জানেগা হুজুর?

নিরুদ্বেগে সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

—ইস্তাহারকা কাগজ কাঁহা মিলা থা?

—ইস্তাহার হুজুর—

—ইস্তাহার হুজুর! বেটা তুম মহা-ন্যাকা হ্যায়! ইস্তিহার! ডুম্বাকা ইস্তিহার! লাল ডুম্বা!

—ওঃ! লাল ডুম্বা! কাগজ? হাঁ হুজুর।

—কাঁহাসে মিলা?

—ছাপাখানাসে।

—ছাপাখানাসে!

—হুজুর বোল্‌তা কাশ্মীরী ঝুটা বোল্‌তা। সাচ্ বোল্‌তা হুজুর, এতবার নেহি কর্‌তা। হুজুরকা খোসি!

লাল দুম্বা

প্রশান্ত সমুদ্রের মত শান্ত—হিমালয়ের মত স্থির—নিশিকান্ত নিরুপদ্রব উপদ্রবের পরিপোষক—বুঝি এবার তাকে হাত তুলতে হয় মাল্লার গায়ে !

—ছাপাখানাসে ক্যায়সা মিলা ?

—দাম দেকে ছাপায়া।

দাম দিয়ে ছাপিয়েছে ? কার কথায় ? পেশোয়ারীর কথায়। কেন ? তার ইচ্ছা হয়েছিল, বাঙ্গালী বাবুকে ঠকাবে।

—হুজুর বোল্‌তা, কাশ্মীরী ঝুটা বোল্‌তা। কভি নেহি বোলেগা।

জোঁকের মুখে লবণ পড়ছিল। বলবার কিছু নাই।

—হাজার রূপেয়া কেয়া হুয়া ?

—দেখিয়ে না হুজুর। চার টাকা কাগজ ছাপাই— চার টাকা দুম্বা রাঙাই—

—দুম্বা রাঙাই !

—হুজুর, সাদা বক্‌রী লিয়া ছ রূপিয়ামে। শালওয়ালা সে রাঙায়া চার রূপিয়ামে। বহুৎ আচ্ছা রঙ্‌ কিয়া হুজুর। দেখিয়ে না !

তার আজ্ঞায় গফুর দুম্বা নিয়ে এলো। সত্যই রাঙাইবার বাহাদুরী আছে ! সূর্য্য-কিরণে মেষের লাল পশম যেন অগ্নি-শিখার মত জ্বলছে !

বাকী রূপিয়া কেয়া কিয়া ?

—ঝুটা নেহি বোলেগা, হুজুর। কাশ্মীরী বোল্‌তা ঝুটা। হাম নেহি বোলেগা, হুজুর। আধা আধা—ফজলু আধা, রমজু আধা।

অতি শান্ত-স্বরে সবিনয়ে রমজু কথা কইছিল! সে যেন তার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থে একটা মসজিদ ওয়াকৃফ করেছে, এমনি তার কথার ভঙ্গী !

নিশিকান্ত কি বলবে, ভেবে পেলো না। তার মনোভাব বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তার ছিল না।

রমজু বল্‌লে,—হুজুর ইস্‌কো কাটেগা আজ? না বক্‌রীদমে? আচ্ছা গোস্ত হোগা। কাট্‌ চাপ, পোলাও আর রোষ্ট বানায়গা হুজুর?

নিশিকান্ত বল্‌লে—বেরো বেটার ছেলে আমার সাম্‌নে থেকে। ডুম্বাকে আমি নিয়ে যাবো—আমার আক্কেল-সেলামীর চিহ্ন।

রমজু বললে—যো হুকুম, হুজুর।

এক-মুখ টেবিল ঢাকা মুখে—ভেড়া ডাকলো,—ব্যাঃ ব্যাঃ ব্যাঃ ব্যা ব্যা বা।

নিশিকান্ত শুনলো, ভেড়া বল্‌ছে—নিশিকান্ত. না. ভ্যা-ভ্যা ভ্যাবা-কান্ত।

দ্বিতীয়-পালা

—ভানু মিত্রের বিবৃতি—

কে যেন কবি বলিয়াছিলেন—পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, মানুষ কিরূপে জানিবে। একথা যিনি লিখিয়াছিলেন তিনি কবি—নিশ্চয় পুলিসে কোনোদিন কর্ম্ম করেন নাই, বা যাহারা সরকারী বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে তাহাদের চরিত্র আলোচনা করেন নাই। আমি শ্রীযুক্ত ভানু লাল মিত্র—দীর্ঘ আটাশ বৎসর কাল থানায় এবং সি-আই-ডি বিভাগে কর্ম্ম করিয়া পুরুষ চরিত্রের যে জটিল দুর্ব্বোধ আচরণের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় মানব-প্রকৃতি-পাঠের প্রথম ভাগ পড়িলে সকল স্ত্রী-চরিত্র মোটেই রহস্য-ঘেরা নয়। কিন্তু অপরাধীর চরিত্র—হাঃ ভগবন!

এক শ্রেণীর অপরাধী দেখিয়াছি পথের ধারে লোকের পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহারা দাঁত দিয়া সেকাঁটা বাহির করিয়া দেয়। অথচ বিনয়-নম্র বদনে কৃতজ্ঞ ও প্রশংসা-মুখর জনতার ভিতর হইতে বাহির হইবার সময় তিন-জন গরীব কেরাণীর পকেট মারিয়া তাদের সমস্ত মাসের বেতন লইয়া সরিয়া পড়ে। উভয় কার্য্যই করে সে আন্তরিকতার সঙ্গে। মিষ্টার নির্ম্মলকান্ত রায়ের সহিত পরিচয় ছিল না যতদিন নিযুক্ত ছিলাম কর্ম্মে। কর্ম্ম অন্তে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গার ধারে। ভদ্রলোক একজন বন্ধুর সঙ্গে দড়ির দোলনায় দুলছিলেন। দোলনার নীচে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল প্রকাণ্ড একটা ভেড়া! ধবধবে সাদা তার বর্ণ।

সত্যই বিচিত্র। লোকে কুকুর পোষে। যদি কেহ বাঁদর বা ভেড়া

রাখে গৃহে—প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে ঘোরে না—বিশেষ প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে একখানা ডেম্‌লার গাড়ীতে বসাইয়া। লোকটার চরিত্র যে বিচিত্র তার আরও প্রমাণ পাইলাম যখন একজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল—সে ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত—কিছু অর্থ-সাহায্য না পাইলে জাতিচ্যুত হইবে।

আমি মনে মনে হাসিলাম। এ রকম পিতৃদায় মাতৃদায় কন্যাদায় সহৃদয় অনেক সরল লোকের অর্থ-শোষণ করে। সুতরাং মনে যে সব কথা উঠিতেছিল তাহাদের অপ্রকাশিত রাখিয়া বলিলাম—আজ্ঞে এখানে বেড়াতে এসেছি—ক্ষমা করবেন।

ভিক্ষুক বলিল—যদি দয়া করে ঠিকানা দেন তো না হয় মশায়ের বাড়ী গিয়ে—

—ট্রেণভাড়া দিয়ে ?

—আজ্ঞে কি করব—কন্যাদায়।

—ক্ষমা করবেন। মজুরি পোষাবে না।

এরা মানুষের মুখ দেখিলে বুঝিতে পারে কোথায় সুবিধা হইবে · কোথায় হইবে না। সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া দোদুল্যমান নির্ম্মলকান্তের নিকট গেল।

নির্ম্মলকান্ত শুনিয়াছিল আমাদের কথোপকথন। সে সহাস্য-মুখে নামিল দোলনা হইতে। কন্যাদায়গ্রস্ত তার নিকট নিজের আবেগভরা কাহিনী বিবৃত করিল।

নির্ম্মলকান্ত বলিল—দেখুন দু'টা বিপরীত সমস্যা দোব আপনাকে। এখনি যদি বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারেন অবিবাহিতা কন্যা—গেল-গেল-জাত ইত্যাদি ইত্যাদি বিয়ের সব খরচ দোব—আর—

ব্রাহ্মণ বলিল—হুজুর পরিহাস করছেন, আমার গ্রাম এখান থেকে তিন ক্রোশ—কাদা ভেঙ্গে যেতে হয়।

—কুছ্ পরোয়া নেই।

—আজ্ঞে কাকেও পাঠান।

নির্ম্মলকান্ত বলিল—বাবা বিবাহে আম্-মোক্তারনামা চলে না স্বয়ং দেখে আসব।

লোকটার উপর আমার ভক্তি হইতেছিল। ব্রাহ্মণ বলিল—কি বলব হুজুর আমারই অদৃষ্ট খারাপ।

—মোটেই না। কপালগুণে গোপাল পেয়েছ! বিয়ের সব খরচ দোব চল।

• ইতিমধ্যে যাহারা গিয়াছিল গঙ্গার বায়ু সেবন করিতে—বিভিন্ন গাছ-তলা হইতে আসিয়া জুটিল।

নির্ম্মলকান্ত বলিল—তবে দ্বিতীয় সমস্যা শোন। আমি এক থেকে দশ গুণব। তার মাঝে যদি বল—বাজে কথা—নগদ এক টাকা দোব। কিন্তু তারপর আর ভদ্রলোকদের অন্ততঃ আজকের মত জ্বালাতন করতে পারবে না।

সে পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিল। লোকের ভিড় একটু নিকটস্থ হইল। ভেড়া আসিয়া দাঁড়াইল মনিবের চরণপ্রান্তে।

নির্ম্মলকান্ত হস্তে টাকা—হাঁকিল—এক—দুই—শিগ্গির ব'লে ফেল —তিন - চার—ব'লে ফেল—পাঁচ—

—আজ্ঞে তাই দিন।

ব্রাহ্মণের কথায় হাস্যের রোল উঠিল। নির্ম্মলকান্ত বলিল—তা হবে

না ঠাকুর। সোজাসুজি বল্‌তে হ'বে—বাজে কথা। এখনও দেখ—ছয়—সাত—আট—এখনও—নয়—

—বাজে কথা।

একটা ভীষণ গণ্ডগোল হইল। যে ছেলেগুলা তালপাতার টুপী বিক্রয় করে আর টিফিনের চুব্‌ড়ি নিয়ে যায় মোটর গাড়ী হইতে—তাহারা হাত-তালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যোৎসবের অবসরে ব্রাহ্মণ ঝাউ-গাছের ঝোঁপ ছাড়িয়া বাজারের দিকে অন্তর্ধান করিল।

তখন বক্তৃতা আরম্ভ হইল। যাহারা কস্মিন্‌কালে দান করে নাই তাহারা অযথা দাতব্য সম্বন্ধে তীব্র মতবাদ প্রকাশ করিল। দেশের অবস্থার কারণ যে এই প্রকার ফেরেবী ভিক্ষুকের অত্যাচার তাহা সপ্রমাণ করিল একজন দুর্দ্ধর্ষ যুক্তি-তর্কের দ্বারা। জনৈক খদ্দর পরিহিত-ভদ্রলোক বলিলেন—স্বরাজ হ'লে এই সব জুয়াচুরি আর চলবে না।

আমার মত একজন পেন্সনার বলিল—কেন মশায়?

বাগ্মী দেশহিতৈষী বলিল—নিজেদের কর্ম্ম বহাল রাখবার জন্য পুলিস এসব প্রশ্রয় দেয়। এটুকু বুঝতে গেলে একটু তলিয়ে দেখতে হয় দেশের সকল ব্যাপার।

আমাকে দেখিয়ে নির্ম্মলকান্ত বলিল—বলবেন না মশায় ওকথা! ইনি প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ভানু মিত্তির মশায়।

পুলিসের সান্নিধ্য বাগ্মীদের একটু কাবু করে—বিশেষ একশ্রেণীর তথা-কথিত দেশহিতৈষীদের। ধীরে ধীরে তরল ভিড় বিচ্ছিন্ন হইল।

আমি নির্ম্মলকান্তকে বলিলাম—মশায় আমায় চিনলেন কি করে?

লাল তুম্বা

—ট্রেণের চুরি কেসে ঘাটশিলায় দেখেছিলাম প্রফেসার সেনের বাসায়।

আমার স্মৃতিপটে উদয় হ'ল সেই রহস্যময় দস্যুতার কথা। সে কাহিনী বিবৃত করিতেছি এই ইতিবৃত্তে। বলিয়া রাখি এস্থলে—সাদা ভেঁচাটী কাশ্মীরের সেই লাল-তুম্বা।

আমি সে সময় জানিতাম না নির্ম্মলকান্তের জীবনকাহিনী। লাল-তুম্বা কি প্রকারে সে লাভ করিয়াছিল সে ঘটনা সে নিজে আমাকে বলিয়া-ছিল—তার সঙ্গে তার অন্য কৃতিত্ব অপরাধী-জগতে যাহা এই জীবন-চরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহার সঙ্গে ছিল অনেক খাদ্যদ্রব্য। তাহার মাঝে পেশোয়ারী মেওয়া অনেক। সে আমাকে খাইতে দিয়া বলিল—এগুলা আমার এক পুরাতন ভৃত্যের দান।

—পুরাতন ভৃত্যের দান?

—রবিবাবু পুরাতন ভৃত্য এঁকেছেন বাঙ্গালীর ঘরের পুরাতন ভৃত্য। সে প্রভুভক্ত আপন-ভোলা, মনিব হ'তে উচ্চ তার প্রাণ। কিন্তু তার ভেতর রোমান্স নাই যেহেতু বাঙ্গালী জীবনে ঐ পদার্থটার অভাব।

আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। সে বলিল—আমার এ ভৃত্য রোমান্টিক। কেষ্টকান্ত মনিবের রোগ নিতে পারে—সাহাবাজ খাঁ তা বোধ হয় পারে না। কিন্তু মনিবের জন্যে সাহাবাজ খাঁ গুলি বা ছুরি মারতে বা খেতে পারে যা' কেষ্টকান্ত পারে না।

অথচ এই সাহিত্যিক ভাব-বিশ্লেষক ছিল ঠক্ ও দস্যু! তাই বলিতেছিলাম মনুষ্যচরিত্র জটিল—দেবের নিকটও অবোধ্য।

—ট্রেণে দস্যুতা—

প্রভাতে উঠিয়া "ঢক্কা-নিনাদ" সংবাদপত্রে পড়িলাম—

"ট্রেণে দস্যুতা।—গতকল্য বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বোম্বাই মেল প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বে হাওড়ায় পৌঁছিয়াছে। আমাদের 'বিশেষ সংবাদদাতা' বিলম্বের কারণ জানিতে গিয়া যে লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ অবগত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে মনে হয়, রেল-লাইনের অরাজকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সকল ভীষণ দস্যুতার কবে শেষ হইবে? ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য তিমির-গর্ভে দৃষ্টি না চলিলে সে কথার উত্তর দেওয়া যায় না।"

আমি গৌর-চন্দ্রিকা শুনাইয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে চাহি না। তবে এই প্রকার "ভীষণ দস্যুতা" প্রভৃতি ঘটনা বাস্তবিক শেষ হইলে, 'ঢক্কা-নিনাদ' প্রমুখ সংবাদপত্র পরিচালকদের যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, সে দুঃখের ছায়াটুকু আমার মনে সে সময় পড়িয়াছিল। তাহার পর 'বিশেষ সংবাদদাতা' মহাশয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্বায়ত্তশাসন ও হোম-রুলের পূর্ণ অধিকার না পাইলে ভারতবাসীর নিস্তার নাই। যতদিন বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব থাকিবে, ততদিন ট্রেণে চুরি হইবেই। আমি আপাততঃ সে উৎকট যুক্তিতর্কের কবল হইতেও আপনাদিগকে রক্ষা করিলাম।"

শেষে অকর্ম্মণ্য পুলিসের কর্ত্তব্যহীনতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক সরস মন্তব্য প্রকাশ করিয়া "ঢক্কা-নিনাদ" লিখিয়াছিল—

"চুঁচুড়ার ধনবান পোদ্দার শ্রীযুত দিগ্বিজয় পাইন আরও পাঁচ-সাতজন

স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অর্থ লইয়া বোম্বাই সহরে সুবর্ণ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন—শ্রীযুত বসুদাম বড়াল। ইহারা ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে বোম্বাই গিয়াছিলেন—চল্লিশ হাজার টাকার সুবর্ণ ক্রয় করিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলে ফিরিতেছিলেন। প্রায় রাত্রি বারটার পর বামড়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার সময়ও তাঁহারা উভয়ে জাগ্রত ছিলেন। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ছিলেন—সহযাত্রী ছিলেন অপর একজন। ইনি উঠিয়াছিলেন পেনড্রায়।

"সহযাত্রী যখন গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, তখন ব্যবসায়িগণ তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর ফিরিঙ্গি বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন—পরে কিন্তু প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি কলিকাতার বিখ্যাত প্রফেসার—মিঃ প্রফুল্ল সেন।"

প্রফেসার সেন! পড়িয়াই আমি বিস্মিত হইলাম। প্রফুল্ল নাকি! প্রফুল্ল পূজার ছুটিতে সপরিবারে ঘাটশিলায় বাস করিতেছিল—সম্ভবতঃ সে কি একটা উৎকট খামখেয়ালি বাসনায় প্রবুদ্ধ হইয়া পেনড্রায় গিয়াছিল। তাহার সম্মুখে দস্যুতা! খুব হাসির কথা! সে আমাকে চিরদিন উপহাস করিত, বলিত—পুলিস বিভাগে কোথাও একটু বুদ্ধি থাকিলে দেশের পাপ অর্দ্ধেক কমিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমস্ত খুনী মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহার এক একটা থিওরি ছিল। এবারে একেবারে তাহার চক্ষের উপর চুরি হইয়াছে—দেখি, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ প্রফুল্ল সেন এই "ভীষণ দস্যুতা" সম্বন্ধে কি বলেন।

"পোদ্দার মশায়গণের এজেহার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বোম্বাই মেল পুসিটা ও গোয়ালকেড়ার মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ পার হইবার পরেই দস্যুতা হইয়াছিল। এই পর্ব্বতময় প্রদেশটি ভীষণ অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত

পথের তিন দিকে শৈল—উপত্যকার মধ্যে রেল-বর্ত্ম। যেখানে তিনটি পাহাড় একত্র মিলিয়াছে ঠিক সেইস্থলে সম্মুখের গিরি ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ। দস্যুতা ঠিক সুড়ঙ্গের ভিতর হইয়াছিল কি সুড়ঙ্গের বাহিরে হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু দস্যুতার অব্যবহিত পরেই প্রফেসার সেন এলর্ম্ সিগ্‌নাল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়াছিলেন। ট্রেণ সুড়ঙ্গের মুখ হইতে প্রায় একশত ফুট বাহিরে থামিয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, দস্যু টানেলের ভিতরকার সূচীভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে কার্য্য সমাধা করিয়াছে। গাড়ীর তাড়িত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া সেই প্রকোষ্ঠের আরোহিগণ নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন। হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং দিগ্বিজয় পোদ্দার অনুভব করিলেন যে, কে তাঁহার পা ধরিয়া টানিতেছে।”

বুঝিলাম, তাহা হইলে তাড়িতালোকেই. চুরি হইয়াছে। সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতার টানেলের সূচীভেদ্য অন্ধকারের গবেষণাটুকু ব্যর্থ হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কথাটুকু বলিতেছি, ঐ শ্রেণীর জীবের পুলিসের উপর তীব্র মন্তব্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্দেশ করাইবার জন্য। যাহারা এই বিদ্যা বুদ্ধির মূলধন লইয়া মসীজীবী, তাঁহাদেরই যত প্রকোপ গরীব বেচারা পুলিসের উপর—যাক্ সে কথা।

“বলা বাহুল্য, শ্রীযুত দিগ্বিজয় বিস্মিত হইয়া বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল। আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া তাহার হৃৎকম্প হইল। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক সশস্ত্র কাফ্রি। রক্তবর্ণ চক্ষু, হস্তে পিস্তল। সে মাত্র একটি কথা বলিয়াছিল—‘দো’। শ্যামা পূজার রাত্রে হাঁড়ি চাপা দিয়া একদমা পট্‌কা পুড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই ‘দো’ শব্দ সেইরূপ গভীর

—গম্ভীর। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত দিগ্বিজয় সেই আটখানি বহুমূল্য সুবর্ণ ইষ্টক বস্ত্র জড়াইয়া একটি উপাধান নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই বালিসে মাথা দিয়া তিনি নিদ্রিত ছিলেন। সেই ভীম-স্বরে ভীত হইয়া সাহস পাইবার জন্য তিনি বাঙ্কের নীচে চাহিয়া দেখেন, বসুদাম পোদ্দারও সন্ত্রস্ত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতেছেন। তখন লোকটা আর একবার "দো" বলিল। তাহাতে অধ্যাপকের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি দাঁড়াইয়া উঠেন এবং 'কোন্ হায়,' বলিয়া চীৎকার করেন। তাহাতে দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়।"

এবার আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বর্ণনাটা পড়িলাম।

"কথায় বলে, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' গুলিটা প্রফেসারের গায়ে লাগে নাই। তিনি কিন্তু অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন দুর্ব্বৃত্ত কাফ্রি-কুল-গ্লানি তস্কর-প্রবর গম্ভীরভাবে গিয়া পোদ্দারের সুবর্ণগর্ভ উপাধানটি তুলিয়া লইল। পোদ্দার ভয়ে কোন কথা বলিতে পারে নাই, বর্ব্বরের অবৈধ কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই। বেশ দৃঢ় পাদবিক্ষেপে তস্কর প্রকোষ্ঠের দ্বারের নিকট গিয়া প্রথমে আলোক নির্ব্বাপিত করিল; তাহার পর ধীরভাবে দরজা খুলিল। দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ অবধি উঁহারা শুনিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত বাহিরে গিয়া বোধ হয় গতিশীল ট্রেণ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিল।

"লোকটা প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেলে আরোহীদের আশঙ্কা তিরোহিত হইল। অধ্যাপক মহাশয় আপনার শয্যায় বসিয়া সাহসে ভর করিয়া গাড়ী থামাইবার শিকল ধরিয়া টানিয়া দিয়াছিলেন। গাড়ী থামিলে তবে তাঁহারা ভরসা করিয়া উঠিয়া আলো জ্বালিতে সমর্থ হন।

"গাড়ীর কণ্ডাকটার, গার্ড, ড্রাইভার, ইংরেজ আরোহী প্রভৃতি আসিয়া নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিলেন বটে, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ব্যাঘ্র-ভল্লুক সমাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। এস্থলে গাড়ী কাটিঙের ভিতর দিয়া যায়, দুই পার্শ্বের লম্বমান কোন একটি বৃক্ষশাখা ধরিয়া দুর্বৃত্ত বেগবান গাড়ী হইতে পলাইয়াছে, অধ্যাপক সেন প্রভৃতির এইরূপ ধারণা।

"আমরা এই বর্ণনা শুনিয়া যুগপৎ স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কতদিন এই প্রকারে নিরীহ ভারতবাসী রেলযাত্রী দস্যু-তস্করের নির্যাতন ভোগ করিবে"—ইত্যাদি। শেষে আর একবার পুলিসের অকর্মণ্যতা ও হোমরুলের উপকারিতা সম্বন্ধে হুঙ্কার ছাড়িয়া 'ঢক্কা-নিনাদ' প্রবন্ধ শেষ করিয়াছে।

কিন্তু সেই ঢাকের বাদ্য শেষ হইতে-না-হইতেই তারে সংবাদ আসিল যে, আমাকে স্বয়ং এই তদন্ত করিতে হইবে।

—প্রফেসার সেন—

ঘাটশিলার সুবর্ণরেখা নদীর মাঝখানে একখানা কচ্ছপের মত পাথরের উপর পাগলা প্রফেসার বসিয়াছিল। পাথরে একখানা ডিঙ্গি বাঁধা। সুবর্ণরেখা সেই বড় পাথরখানার তলায় গর্জ্জন করিতে করিতে একটানা বহিয়া যাইতেছিল। নৌকার দড়িতে যে বিধিমতে টান পড়িতেছিল, ডিঙ্গির নাচন-কোঁদল দেখিয়া তাহা বেশ বোধগম্য হইতেছিল।

আমাকে দেখিয়া প্রফেসার মহাসমারোহে 'হ্যালো, হ্যালো' করিয়া পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে তীরে ডাকিলাম, সে নৌকা খুলিয়া চলিয়া আসিল।

নদীর পাড় বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তাহাকে বলিলাম—কই, এত যে সমালোচনা কর, চোখের উপর এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, চোর ধরতে পারলে না। পিস্তলের গুলি বড়—

সে বলিল—বাঃ! ইচ্ছা করলে ধরতে পারতাম না?

আমি হাসিয়া বলিলাম—কেন ইচ্ছাটা হ'ল না? আর খবরের কাগজের কথাটা যদি সত্য হয়—

সে আমাকে বাধা দিয়া বলিল—হ্যাঁ, কথাটা সত্য। একবার ইচ্ছা হয়েছিল, সেটা অসময়ের ইচ্ছা—অকালপক্ক ইচ্ছা।

আমি বলিলাম—ডাঁশা বা গাছপাকা ইচ্ছার সময় কোন্‌টা?

সে বলিল—একটা সুবিধার সময় ছিল। যে সময়টা বালিস বগলে করে লোকটা আলো নিবিয়ে দিলে, ঠিক সেই সময়, সাহস ক'রে ছুটে, তাকে জড়িয়ে ধরতে পারলে, তার হাতের পিস্তল হাতে থেকে যেত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে অমন সুবিধা পরিত্যাগ করিল কেন? বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই বলিয়া।

অধ্যাপক একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—সাহসের কথা নয়। কারণ লোকটার নরহত্যা করবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। সে আমার দিকে যে গুলিটা ছুঁড়েছিল, সেটা ইচ্ছা ক'রে জানলার বাহিরে টিপ্‌ করেছিল।

আমি বলিলাম—তবে ধরলে না কেন?

সে বলিল—কারণটা খুব সোজা। যাদের টাকা গেল, তারা কিছু করলে না। আর আমার চেয়ে সুবিধা ছিল বসুদাম বাবুর। তাঁর পক্ষেই উচিত ছিল—

আমি বলিলাম—যাক, বোঝা গেছে। আর সুবিধা কখন ছিল ?

সে বলিল—যখন আমি দড়ি টেনে গাড়ী থামালাম। লোকটা বসুদামের দিক দিয়ে নেমেছিল, সে যদি সে সময় একবার জানলা দিয়ে তাকাত, তা' হলেই বুঝতে পারত লোকটা কোন্ গাড়ীতে উঠল।

আমি বলিলাম—সে কি ? দড়ি টান্‌বার আগেই তো সে পালিয়েছিল।

সে বলিল—পাগল হয়েছ ? এমন কে বাহাদুর আছে যে, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুটছে এমন ট্রেণ থেকে নেমে পড়ে ?

আমি বলিলাম—কেন ? নামবে কেন ? সাহসে ভর করে কেবল একটা গাছের ডাল ধরলেই হ'ল। গাড়ীর বেগে সে আপনিই গাছের ডালে ঝুলে থাক্‌বে।

সে বলিল—আর সোনার ইট্‌গুলা ?

আমি বলিলাম—ফেলে দেবে। তারপর কুড়িয়ে নেবে।

এ কথায় সে হাসিল। ঘন অন্ধকারের ভিতর প্রথমতঃ ঠিক বৃক্ষশাখা দেখিতে পাওয়া, তাহার পর তাহার দেহের ভর সহিতে পারিবে এমন উপযুক্ত বৃক্ষশাখা নির্ব্বাচন করা খুব সোজা কথা নয়। ও থিওরিটা স্থূলবুদ্ধি ফিরিঙ্গী গার্ড কল্পনা করিয়াছিল ! আমার মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ও সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা অসমীচীন হইয়াছে—বিশেষ আমি যখন গ্রাজুয়েট ও বুদ্ধিমান—ইত্যাদি। তবে পুলিসের কার্য্যে ধর-পাকড়ের

আসুরী শক্তি পাইলে বুদ্ধি-শক্তি লোপ পায় বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি। যেরূপ গম্ভীরভাবে ন্যায়-শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক বন্ধু কথাগুলা বলিল, তাহাতে তাহার উপর কিছু মাত্র বিরক্ত হইলাম না। সে পাগল, তাহার সহিত তর্ক করা বৃথা। উপসংহারে সে বলিল—লোকটা নামবার আগে আলো নিবিয়ে ছিল মনে আছে? কেন? যদি সে অতবড় একটা জিমনাষ্টিক করবার ক্ষমতা রাখত তা' হলে সেটা দেখাবার লোভ সে ছাড়তে পারত না। বিশেষ গাড়ীর কামরায় আলো থাকলে তার ডাল ধরবার সুবিধা হ'ত। যখন তাকে কেহ তাড়া করেনি, তখন সে অসম-সাহসিক কাজ করে নিজের স্ত্রীর বৈধব্যের সম্ভাবনা ডেকে আনবে কেন?

. কথা কহিতে কহিতে আমরা তাহার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন রাঙা রবি পাহাড়ের পিছনে ডুবিয়াছিলেন; পশ্চিম গগনে পাহাড়ের মাথার উপর ছিল খুব খানিকটা টক্‌টকে লাল রঙ্। বন্ধু আমাকে বাহিরে একখানা আরাম-কেদারায় বসাইয়া বাড়ীর মধ্যে নিজে চা আনিতে গেল। আমি তাহার কথাটা লইয়া মনের ভিতর তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক থিওরিটা সম্ভবপর। লোকটা আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া গাড়ীর বাহিরে অপেক্ষা করিল—বেশ কথা তাহার পর গাড়ী থামিলে ধীরে ধীরে নামিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়া গেল।

নানা প্রকার আহার্য্য লইয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম—আচ্ছা, যে জায়গায় চুরি হ'য়েছিল' সে স্থল থেকে কতক্ষণ ছুটে তবে গাড়ী দাঁড়ায়?

সে বলিল—অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক।

আমি বলিলাম—তবে!

সে বলিল—আবার পুলিসের বুদ্ধি! তবে কেন? লোকটা কত ঠাণ্ডা মাথায় কাজ হাসিল করেছে দেখছ না? সে এটুকু ঠিক বুঝেছিল যে, আমাদের মধ্যে কেহ না কেহ গাড়ীর দড়ি টানবে। পাছে চুরির আগে টেনে ফেলি—তাই সে গুলি ছুঁড়েছিল। পাছে না টানি তাই সে বাহিরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আর নেহাৎ যদি আমরা না টানতাম, সে নিজে শিকল টেনে গাড়ী থামাত।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা হ'লে কাফ্রিটা তোমার মত ন্যায়-শাস্ত্র পড়েছিল।

সে বিস্ময়ে বলিল—কে, কাফ্রি?

আমি বলিলাম—কেন, চোরটা!

সে বলিল—হরি! হরি! অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে থাকবে ব'লে বেচারা একটা ছদ্মবেশও পরবে না? আর অত বড় চুরিটা করলে কি মুখখানা দেখাবার জন্য? বলি, এত মোকদ্দমা কর—পুলিস কোর্টের এত মামলার বিবরণ পড়—কাফ্রিতে মারপিট্ করেছে বা হোঁৎকামি, গুণ্ডামি করে কেড়ে-বিগড়ে নিয়েছে, এ ছাড়া অন্য কথা কি শুনেছ?

আমি এবার দোষ স্বীকার করিলাম। তবু নিজের কথা বজায় রাখিবার জন্য একবার বলিলাম—কেন, কলকাতার ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কাফ্রিগুলা। যারা ইংরাজী কথা কয়—ফিরিঙ্গি মেম বিয়ে করে—

সে বলিল—তাদের জনসংখ্যা খুব কম। আর তাদের মধ্যে এমন সংযমী পুরুষ কেহ নাই যে, গুলি মারবার অমন প্রশস্ত সময়টা পেয়ে

আমার মাথা বাঁচিয়ে অনিশ্চিত অন্ধকারের উপর গুলি মারে। আর ও সম্বন্ধে তার চেয়েও একটা বড় যুক্তি আছে – চাক্ষুষ প্রমাণ।

আমি বলিলাম—যথা!

সে বলিল—গাড়ী থামবার পর গার্ডের সঙ্গে আমরা সমস্ত গাড়ী খুঁজেছিলাম। গাড়ীতে কোনও কাফ্রি ছিল না।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কেন গাড়ীতে থাকবে কেন?

প্রফেসার বলিল—এস এস, তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। আমি তোমাকে সুরেশ মিত্তিরের বাংলাটা ভাল করে দেখাই। চাল্লিশ টাকায় বাড়ীখানা সস্তা পাই নি?

—বাঘ মারা—

চক্রধরপুর ষ্টেশনে তদন্ত করিয়া যে সকল বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে প্রফেসার সেনের অন্ততঃ দুইটা ধারণা যথার্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তস্কর বাস্তবিক কাফ্রী নয় এবং দ্বিতীয়তঃ সে গাড়ীতেই ছিল, জঙ্গলে নামিয়া পলায় নাই। গাড়ী থামিবার পর গাড়ীতে একবার খোঁজ হইয়াছিল—কোনও কৃষ্ণকায় ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চক্রধরপুরেও প্রত্যেক আরোহীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল—প্রফুল্ল স্বয়ং এবং পোদ্দার দুইজন প্রতি প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু কাফ্রী দস্যুর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

অথচ দস্যু গাড়ীতে ছিল—এ কথা বলিবারও বিশেষ যুক্তি আছে।

চক্রধরপুরের লোকের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, প্রাণের মায়া যদি মানুষের সহজাত বৃত্তি হয়, তাহা হইলে যে স্থলে গাড়ী থামিয়াছিল, সে স্থলে রক্তমাংসের ক্ষণভঙ্গুর নরদেহ লইয়া কাহারও পক্ষে তিলার্দ্ধ অবস্থান করা সম্ভবপর নহে, বিশেষ অন্ধকার রাত্রে। ট্রেণে চুরি হইবার ঠিক দুই দিন পূর্ব্বে একটী শার্দ্দূলের মৃতদেহ লইয়া দুইজন ড্রাইভারেরর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, মাত্র তাহার উল্লেখ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, স্থানটা কিরূপ হিংস্র-জন্তু সমাকীর্ণ। এ অঞ্চলে বাঘ মারিতে পারিলে চাইবাসার ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট পুরস্কার পাওয়া যায়। কিন্তু পুরস্কার পাইতে গেলে সাহেবকে ব্যাঘ্রের মস্তক দেখাইতে হয়। খুব বড় একটী বাঘের দেহ লইয়া চক্রধরপুরের ষ্টেশনে আসিয়াছিল একজন ড্রাইভার। কিন্তু সে দেহে মস্তক ছিল না। সকলে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—ঠিক সুড়ঙ্গের বাহিরে দুইটা বাঘ দ্বন্দ্ব করিতেছিল, সে দক্ষতার সহিত মালগাড়ী চালাইয়া তাহাদের উপর পড়ে। বাঘিনীটা পালাইয়া যায়,—কিন্তু সেই গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া ব্যাঘ্রটা পলাইতে পারে নাই। সে গাড়ীতে কাটিয়া মরে। এঞ্জিনের সম্মুখে যে লৌহের "গরু ধরা" বা কাউক্যাচার থাকে, তাহাতে সেই মৃত শার্দ্দূলের শিরহীন দেহটা আটকাইয়া যায়। পলায়িত বাঘিনীটা পাহাড়ের উপর বসিয়া তখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, ড্রাইভার সাহেব ভয়ে গাড়ী থামাইয়া ব্যাঘ্রের খণ্ডিত মস্তকটি তুলিয়া লইতে সাহস করে নাই।

বলা বাহুল্য, তাহার দক্ষতার সহিত এঞ্জিন চালাইবার অংশটুকু ছাড়িয়া দিলে, এবং বাঘিনীর তর্জ্জন গর্জ্জনে সাহেবের হৃৎকম্প হইয়াছিল,

হয়ত সে ক্ষণিক লুপ্তচেতন হইয়াছিল—এটুকু যোগ করিলে, মোটের উপর গল্পটি সত্য।

সাহেব ত বাঘের দেহ লইয়া কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল। তাহার দুই তিন ঘণ্টা পরে অপর একখানি মালগাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তখন সকাল হইয়াছে—প্ল্যাটফরমের উপর অনেক স্ত্রী-পুরুষ জমিয়াছে। খুব ধীরদর্পে সেই দ্বিতীয় গাড়ীর চালক নামিয়া সকলের সম্মুখে খুব বৃহৎ একটা ব্যাঘ্রের দেহহীন মস্তক বাহির করিল। সকলে বুঝিল—এ দেহহীন মস্তক, মস্তকহীন দেহের। সাহেব পূর্ব্বকাহিনী জানে না। লোকটার কল্পনা-শক্তিও মন্দ নহে। সে খুব বুক ফুলাইয়া বলিল যে, বেগবান ট্রেণ হইতে গুলি মারিয়া সে ব্যাঘ্রটিকে মারিয়াছে। ট্রেণের তলায় পড়িয়া আহত ব্যাঘ্রের দেহটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে কেবল তাহার মাথা কাটিয়া আনিয়াছে।

তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা এ গল্পের বিষয়ীভূত নহে। তাহাকে যাঁহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিগ্রহ অধিক হইয়াছিল কি কল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পীয় শকট-চালক অধিক নিগৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয় আপনারা মাথা ঘামাইয়া সিদ্ধান্ত করুন। আমি চুরি মোকদ্দমার ধান ভানিতে এ শিবের গান গাহিলাম—আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল তাহা প্রমাণ করাইবার জন্য। বাঙ্গালী সম্পাদকেরা বলিয়া থাকেন যে, পুলিস কোনও তদন্তে চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারে না—নিরীহ দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিয়া এবং সাহেবের "পিঠ-চাপড়ান"র গরমে বাঙ্গালার পুলিস এমন অকর্ম্মণ্য! আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, কোন্ সম্পাদক-প্রবর এই সকল ঘটনা শুনিয়া স্থির করিতেন যে,

চোর জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়াছে ? তস্কর নিশ্চয় গাড়ীতে ছিল এবং তাহার কাফীর বেশটা ছদ্মবেশ মাত্র।

—ডুলুয়া—

ঘটনাস্থল দেখিয়া এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইল। তাজমহল, জুমা-মস্‌জিদ বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শোভা তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি সরু রেলপথের দুই পার্শ্ব দিয়া খুব উচ্চ শৈল উঠিয়া যায়, তাহার পার্শ্বে আবার আর এক থাক অদ্রির সারি বিরাট দেহে অসংখ্য চকচকে সবুজ গাছ বসাইয়া একটা সবুজের বিশালতার সৃষ্টি করে, আবার যদি সেই শৈলগুলার পরস্পরের সঙ্গমের স্থল বহিয়া ছোট ছোট ঝরণা গড়াইয়া পড়ে; আবার যদি দৃষ্টির শেষ সীমায় সবুজ গাছের মাথায় আর নীল আকাশের তলায় মিশিয়া যায়; আর যদি সেই জঙ্গলটা নানাজাতীয় পাখীর এলোমেলো বে-সুর বেতালা কাকলীতে পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে বলা শক্ত যে, এরূপ দৃশ্যের শোভা অধিক চিত্তাকর্ষক, না মানুষের গড়া তাজমহল ও দেবমন্দিরের শোভা অধিক মনোরম। সে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লোকালয় নয়নগোচর হইল না। সেই পাহাড়-গুলি চক্রধরপুরের দিকে দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া একটি উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু সেই অরণ্যে কেবল একটী বৃদ্ধকে উদরান্নের জন্য থাকিতে হয়। সে সুড়ঙ্গের প্রহরী—রেলওয়ে কোম্পানীর ভৃত্য। সেই সুড়ঙ্গে বা গিরি-

বর্ম্মে পাথর খসিয়া পড়িলে লাল নিশান বা লাল আলো দেখাইয়া তাহাকে ট্রেণ থামাইতে হয়। দিনের বেলায় সে ছোট একটী ঘানিতে তৈল নির্ম্মাণ করে আর রাত্রে পাথরের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে, আর ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনে। তাহার নিকট শুনিলাম সে জঙ্গলের অধিপতি একটী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র, তাহার মাথায় জটা জন্মিয়াছে, সে এই সুড়ঙ্গ-রক্ষকের কুটীরের পার্শ্ব দিয়া প্রত্যহ চলিয়া যায়, কিন্তু দয়া করিয়া তাহার ঘাড়টি মট্‌কাইয়া দেয় না। এই প্রহরীর নাম ডুলুয়া। ডুলুয়া চুরির কথা শুনিয়াছিল—হঠাৎ ট্রেণ থামিয়া যাওয়ায় সে সেইস্থলে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—আচ্ছা, এখানে কিছুক্ষণের জন্য লুকিয়ে থেকে পরের ট্রেণে চলে যাওয়া সম্ভবপর নয়?

বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকের মত ডুলুয়া আমায় ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল—বাবু এই একটা ডুলুয়া বৈ কোন্ বেটার মাথার উপর মাথা আছে এখানে থাকে। সে রাত্রে যখন ট্রেণ ছাড়ে, তখন ঐ পাহাড়টার টিব্বার ওপর আমি বাবাকে দেখেছিলাম।

"বাবা" অর্থে সেই জটাজুটধারী শার্দ্দূলটা। আমি বলিলাম—বাবাকে দেখেছিস ত' কি হ'য়েছে?

ডুলুয়া বলিল—সে বাবা কেবল একটা মানুষকে খায় না, সে একটা ডুলুয়া আছে। সে একটা অপর মানুষকে পাইলে বাবা ছিঁড়িয়া খায়। প্রথম দিন লাশ—দুসরা দিন শির—তিসরা দিন—

সে যতক্ষণ কথা কহিতেছিল আমি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। তাহার মুখে সরলতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব ছিল না। তাহার সহিত ষড়যন্ত্র না করিলে ট্রেণের বাহিরের লোকের পক্ষে

দস্যুতা অসম্ভব। আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—দেখ ডুলুয়া, তুমি মদৎ না করলে চোর পালাতে পারত না। আমি হয়ত তোমাকে গেরেপ্তার করব। তবে তুমি যদি বল কোন লোক তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, তা' হলে তোমার বিপদ নাই।

ডুলুয়া আবার সেই অবজ্ঞার হাসি হাসিল। সে বলিল—সে একটা ডুলুয়া এখানেও ঘানি টানে—জেলখানা হইলে না হয় সেখানেও ঘানি টানবে।

এবার তাহার মুখে একটু ভিন্ন ভাব দেখিলাম। সে ভাবটি সরলতার চিহ্ন নয়।

—পরিহাস—

প্রফেসার সেন পাহাড় কাটির পাহাড়ের তলায় হাতীজোবড়া নদীর ধারে বসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ছিল কলিকাতার অপর একটী বন্ধু। বেশ লম্বা চওড়া গৌড়বর্ণ চেহারা। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি মিঃ রায়—কলিকাতার ব্যবসাদার। তাহার ভৃত্য দূর হইতে আমাকে স্থানটী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আমাকে দেখিয়া প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইল। একমুখ হাসিয়া বলিল—কি হে চোর ধরলে?

আমি বলিলাম—না। তবে কতকটা ধারণা করেছি। ঘটনা-স্থানটা বেশ করে দেখে এসেছি।

আমরা উভয়ে একখণ্ড খুব বড় কৃষ্ণবর্ণ শিলার উপর বসিলাম। মিষ্টার রায় আমাদের দিকে চাহিয়া একটা বড় পাথরের উপর শুইয়াছিল।

আমি বলিলাম, তোমার দোষ নেই। তোমার মত অবস্থায় সিদ্ধান্ত করতে হ'লে পুলিসের লোককেও বল্‌তে হত যে, চোরটা ভরসা করে সে জঙ্গলে নাম্‌তে পারবে না। কিন্তু—

প্রফেসার বলিল—কিন্তু—

আমি বলিলাম—কিন্তু সেখানে নেমে একটু তদন্ত করলেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, সুড়ঙ্গ-রক্ষকের সঙ্গে একটু ভাব থাকলেই ভরসা করে নেমে পড়া যায়।

মাষ্টার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল। সে বলিল—সেখানে কি একটা টানেল-রক্ষক থাকে ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ। আর টানেলের ঠিক পার্শ্বেই তার বেশ শক্ত একখানি পাথরের ঘর আছে। তার ভেতর প্রবেশ করতে পারলে—

মাষ্টার বলিল—রেলওয়ের লোকের দ্বারা তার ঘরটা খানাতল্লাসী হওয়াই সকলের চেয়ে বেশী সম্ভবপর। সেইটে ভেবেই দস্যুরা কার্য্য করে। তার ঘটে কিছু বুদ্ধি থাকলে—

আমি বলিলাম—সে নিশ্চিত জানত যে সেখানে কেউ তদন্ত করবে না।

পাগলা মাষ্টার বলিল—বলিহারি পুলিস-রত্ন! কেয়াবাৎ বুদ্ধি! এই তোমাদের দোষে এনারকিষ্টদের সৃষ্টি—

আমি বলিলাম—আজ্ঞে না, তোমার মত মাষ্টার ও বিদ্যা-দিগ্‌গজ সম্পাদকের অনুগ্রহে।

তাহাকে বাঘের গল্পগুলা বলিলাম। সেদিন গাড়ীর গার্ড ড্রাইভার যে ভুলুয়ার কুটীরে অনুসন্ধান করেনি তার বিশেষ কারণ আছে।

আমি তাহাদিগকে "বাবা" ব্যাঘ্রের কাহিনীটা বলিলাম। ঠিক ঘটনার দুইদিন পূর্ব্বেই, যে স্থলে বাঘ কাটা পড়িয়াছিল, যে স্থলের সহিত ব্যাঘ্রের অত্যাচারের এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেস্থলে পরের সোনার জন্য লোকে আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিবে না, তস্কর তাহা জানিত। সে চুপ করিয়া গিয়া ভুলুয়ার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল।

প্রফেসার সেন অবজ্ঞার হাসি হাসিল। রায় মহাশয়ও সে উৎসবে যোগদান করিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—সে কাফ্রিটার নামও পেয়েছি। তার নাম জ্যাক বার্লি। আমি কাল তাকে গেরেপ্তার করব। সেন অন্য মনে বলিল—বটে?

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ, তোমার কাছে এসেছি তোমাকে নিয়ে যাব তাকে সনাক্ত করবার জন্য।

সে বলিল—বেশ।

—কাফ্রি জ্যাক—

দুই তিনবার মত বদলাইতে হইয়াছিল বটে, কারণ একটা ধারণায় জোঁকের মত সংবদ্ধ থাকিলে সত্য অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। নূতন

নূতন কথা জানিতে পারিলে, সিদ্ধান্তও নূতন করিয়া গড়িতে পারা যায়। সুড়ঙ্গের ধারের জঙ্গল দেখিয়া এবং বাঘের কাহিনীগুলা শুনিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, ডুলুয়ার কুটীর দেখিয়া এবং গল্প শুনিয়া সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তস্কর চুরি করিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সে ধারণা বর্জ্জন না করিলে উপায় ছিল না। ডুলুয়া রেল-কর্ম্মচারী, বহুদিনের লোক, তাহার সাহসও অসাধারণ, কারণ সে একাকী এই হিংস্র-সঙ্কুল অরণ্যে বসবাস করে। সাহেবেরা সকলেই তাহাকে ভাল বাসে, রেলের সাহেব, বাঙ্গালী সকলেই তাহার নিকট বাঘের গল্প শুনে। কাজেই সামান্য চুরি অপবাদ দিয়া তাহার কুটীরটা কেহ খানাতল্লাস করিবে না—তস্কর এবং ডুলুয়া উভয়েরই যে বিশ্বাস ছিল। প্রফেসার সেন ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই সে ভাবিয়াছিল যে গাড়ী থামিবার পর ডুলুয়ার কুটীর তদন্ত হইবার বাসনাটা লোকের মনে স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠিবে বলিয়া তস্কর স্বর্ণ ইষ্টকগুলা লইয়া সাহস করিয়া তাহার কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না।

ডুলুয়া রেল-কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রিয় বলিয়াই রেল-কর্ম্মচারী চুরী করিয়া তাহার কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তস্কর বেঙ্গল-নাগপুর রেলে কর্ম্ম করে, এবং সেদিন রাত্রে তাহার অবসর ছিল। লোকটা কৃষ্ণকায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান হওয়া সম্ভব।—এবং এই ধারণাটাই তখন আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে দেখিয়াছিলাম, ধারণাটা ভ্রমমূলক। বেঙ্গল-নাগপুর রেলে মান্দ্রাজীদের প্রাধান্য তাই আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, কার্য্য হইয়াছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান কাফি র

দ্বারা কিম্বা কোনও মান্দ্রাজীর দ্বারা। কিন্তু চক্রধরপুর হইতে বামড়া অবধি রেল লাইনে যত মান্দ্রাজী কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র চারিজন খুব কৃষ্ণকায়, সেই চারিজনের মধ্যে দুইজন খর্ব্বাকৃতি এবং তাহাদের বা অবশিষ্ট দুইজনের মস্তকে কাফ্রি জাতিসুলভ কুঞ্চিত কেশ ছিল না। সুতরাং মান্দ্রাজী-থিওরী বর্জ্জন করিয়া আমাকে সেই প্রথম কাফ্রি-থিওরী রাখিতে হইয়াছিল। কাফ্রির পোষাকটা তস্করের ছদ্ম-বেশ, সে ধারণা প্রফেসার সেনের। আমি এ বিষয়ে তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

এ অঞ্চলে কাফ্রি কর্ম্মচারী ছিল মাত্র একজন। লোকটা প্রায় ৬ফুট লম্বা, খুব হৃষ্টপুষ্ট, মদ্যপায়ী, সুতরাং সদাই ঋণগ্রস্ত। জ্যাক বার্লীর সে রাত্রিতে অবসর ছিল—কেহই তাহাকে চক্রধরপুর ক্লাবে দেখে নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম যে জ্যাক বার্লীর সহিত ডুলুয়ার পরিচয় ছিল। আমি স্বয়ং ডুলুয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ডুলুয়া, তুমি বার্লীসাহেবকে জান?

ডুলুয়া বলিল—বালিসাহেব? সেটা কে আছে দারাগো বাবু?

আমি ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, ডুলুয়া আমাকে দারোগাবাবু বলিয়া আমার মর্য্যাদা হানি করে নাই। যাক্ সে কথা। আমি তাহাকে বলিলাম, কাফ্রিসাহেব, জ্যাক বার্লীসাহেব।

ডুলুয়া বলিল—ওঃ সে একটা জেকসাহেব। খুব জানি দারোগাবাবু। সে দুজন লোক এক কোম্পানীর নিমক খায়, সে জানবে না। আমি রেলের সব সাহেবকে চিনি, এই ফিনি সাহেব, কিনিসাহেব, কিণ্টু সাহেব, বাড্‌নি সাহেব,—

আমি তাহাকে থামাইয়া দিলাম। তাহার পর মনস্থ করিলাম, জেকসাহেবক গেরেপ্তার করিব।

—সান্ধন—

প্রফুল্লকে ঘাটশিলায় সংবাদ দিলাম, বৃহস্পতিবার। সে রাত্রে ট্রেণে চলিলাম।

দস্যুর সন্ধান পাইয়াছি, এ সংবাদে পোদ্দারদ্বয় বড় প্রীত হইল। তাহারা আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল। এত বড় দুরূহ সমস্যা যে সাত দিনের মধ্যে মীমাংসা হইয়াছে, এ সংবাদে তাহারা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিলাম। শীঘ্রই যে তাহাদের অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে, সে আশা প্রসন্নমূর্ত্তি লইয়া তাহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

আমি বলিলাম—মশায়, না আঁচালে বিশ্বাস নাই। আমি এখনও আসামী ধরি নাই। সে আসামী কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। হয়ত রেলপথে সকলে তাহার চেহারা জানে ব'লে সে নিজে ডকাতি করেনি, কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা এ কাজ করাইয়াছে।

দিগ্বিজয় পাইন বলিল—মশায়, কান টান্‌টালেই মাথা আসে। আপনি যখন এটাকে ধরেছেন, তখন সবগুলাই একরকম আপনার হাতের ভেতর।

আমি বসুদাম পোদ্দারকে বলিলাম—আচ্ছা, যখন প্রফুল্লবাবু শিকলি

টেনে গাড়ী থামালেন তখন আপনি জানালা দিয়ে একবার বাহিরে চাইলেন না কেন?

সে বলিল—মশায়, এখন এখানে দাঁড়িয়ে কথাটা বলা যত সহজ ঠিক, সেই স্থলে—

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—হ্যাঁ, তা সত্য বটে, তবু—অর্থাৎ তাহ'লে লোকটা কোথায় গেল, ঠিক বুঝতে পারা যেত।

সে বলিল - মশায়, চল্লিশ হাজার টাকা চুরি গেছে, আট জনের-এর মধ্যে আমার নিজের ছিল পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু সেইরকম গুলিটা চালালে প্রাণটা যেত আমার নিজেরই

আমি তাহার সহিত তর্ক করিলাম না। সেদিন তাহারা আমার সহিত যাত্রা করিতে স্বীকার করিল না। সোমবার সন্ধ্যার সময় হাওড়া ষ্টেশনে তাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইল। সকলে একত্রে ঘাটশিলা যাইব। তাহার পর প্রফুল্লকে সঙ্গে লইয়া চক্রধরপুর যাত্রা করিব এইরূপ বন্দোবস্ত হইল

—আবার রাহাজানি—

কিন্তু বন্দোবস্তমত কাজ করিতে পারিলাম না। সেদিন পত্র দিয়া তাহাদের দুইজনকে ঘাটশিলায় প্রফুল্লের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তাহাকে লিখিলাম—"পোদ্দারদ্বয়কে তোমার নিকট পাঠাইলাম। তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তোমার নিজের কথাগুলা থিওরি করিও।

আমি কাল কিম্বা পরশু ঘাটশিলা পৌছিব। আর একটা চুরি হইয়া গিয়াছে। সে বিষয়ও তোমার সহিত আলোচনা করিব।”

যে নূতন চুরির কথাটা লিখিলাম, তাহার সংবাদ পাইয়াছিলাম—রবিবার বোম্বাই মেল ষ্টেশনে পৌছিলে। এ চুরি ঠিক কোথায় হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চুরি গিয়াছিল—কুড়ি হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল নোট্। টাকা কাচ্ প্রদেশের একটি মুসলমান সওদাগরের। ইনি বামড়া-রাজের দুই-একটা জঙ্গলে কাঠ কাটিবার স্বত্ব কিনিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বামড়া হইতে বাইশ মাইল দূরে তাঁহার মোকাম আছে। সেই মোকামের গোমস্তার নিকট হইতে তিনি কুড়ি হাজার টাকা লইয়া শনিবার রাত্রে ট্রেণে উঠেন। টাকা একটি জালের থলির ভিতর ছিল—থলিটি ছিল তাঁহার ট্রাঙ্কের ভিতর। তাঁহার রুমালে ট্রাঙ্কের চাবি বাঁধা ছিল। বাইশ মাইল গো-শকটে কাশিম করিমসাহেব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন গাড়ীতে উঠেন, তখন মাত্র তথায় একজন আরোহী ছিল। বোধ হয় যাত্রী বাঙ্গালী। কাশিম করিম ভাল করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই। যখন তিনি গাড়ীতে উঠেন, তখন বাঙ্গালী সহযাত্রীটি নিদ্রা যাইতেছিল, একবার মাত্র চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়াছিলেন। তাহার পর প্র্যত্যুষে গালুডি ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে সে নামিয়া গিয়াছিল।

শাখা-প্রশাখা বর্জ্জন করিলে মোটের উপর কাশিম করিমের গল্পটি উক্ত প্রকার। পোদ্দারের গল্পের সহিত এ গল্পের কি সংশ্রব ছিল, সে কথা বলিতেছি। সংশ্রব ছিল বলিয়াই এই চুরির সংবাদে আমি অত বেশী বিচলিত হইয়াছিলাম, এবং দস্যুতারও তদন্ত নিজ হস্তে লইয়াছিলাম।

বাঙ্গালী সহযাত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্র—আপনি বাঙ্গালী সহযাত্রীটিকে চিনিতে পারিবেন?

উ—না।

প্র—আপনার বাক্সে নোটের তাড়া ছিল—একথা তাহার জানিবার উপায় ছিল?

উ—সম্ভবতঃ ছিল কারণ আমি ট্রেণে উঠিবার পর চুরুট বাহির করিবার জন্য বাক্স খুলিয়াছিলাম। উপরেই টাকার থলি ছিল, তাহা তুলিয়া মধ্যের বেঞ্চের উপর রাখিয়াছিলাম। তাহার পর চুরুট বাহির করিয়া পুনরায় টাকার থলি বাক্সের মধ্যে ফেলিয়াছিলাম।

প্র—সে সময় বাঙ্গালী যাত্রীর দৃষ্টি সেদিকে গিয়াছিল?

উ—বলিতে পারি না। আমি তাহার দিকে তাকাই নাই।

প্র—আপনার টাকা ছিল থলির ভিতর। বেশ। থলিতে নোট ছিল, তাহা বাহির হইতে বুঝা যায়?

উ—বাঙ্কের জালের থলি। নোট একটু একটু দেখাও যায়।

প্র—বাঙ্গালীটি গালুডিতে নামিবার পূর্ব্বে আপনি বুঝিয়াছিলেন যে নোটের থলি চুরি গিয়াছে?

উ—না। চুরি হইয়া গিয়াছে, একথা প্রথম বুঝিলাম খড়্গাপুরের নিকট আসিয়া। গিড্‌নিতে ঘুম ভাঙ্গে। তাহার পর হাত মুখ ধুইয়া খড়্গাপুরের নিকট চুরুট খাইবার জন্য আবার ট্রাঙ্ক খুলিয়াছিলাম। সেই সময় প্রথম দেখি যে টাকার থলি চুরি গিয়াছে।

প্র—চাবি কোথা ছিল?

উ—রুমালে বাঁধা।

প্র—রুমাল কোথায় ছিল ?

উ—লম্বা কামিজের পকেটে। লম্বা কামিজ গায়ে ছিল।

প্র—খড়্গাপুরে দেখিলেন চাবি বন্ধ আছে ?

উ—হ্যাঁ। চাবি বন্ধ ছিল, কিন্তু কলের খিল আলতারাপের ভিতর দিয়া যায় নাই। সেটা টিপিয়া চাবি দিলে তবে বাক্স বন্ধ হয়! তাড়াতাড়ি চাবি দিলে কলের খিল বন্ধ হয়, কিন্তু বাক্স বন্ধ হয় না। চাবিটা তাড়াতাড়ি দেওয়া হইয়াছিল।

প্র—প্রথম আপনি যখন খড়্গাপুরে বাক্স খুলিলেন, বাক্সের আল্‌তারাপের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আপনি বিস্মিত হন নাই ?

উ—হ্যাঁ, প্রথমে খট্‌কা লাগিয়াছিল। কিন্তু তখনই মনে হইয়াছিল যে, রাত্রে বাক্স খুলিয়া বন্ধ করিবার সময় বোধ হয় অসাবধান হইয়াছিলাম। চুরি যাইবার পর আমার মনে বেশ ধারণা হইয়াছিল যে, চোর টাকা লইয়া বাক্স বন্ধ করিবার সময় ঐরূপ ভ্রম করিয়াছিল। সেইটাই স্বাভাবিক।

প্র—তাহা হইলে আপনি ঠিক্ বলতে পারেন না, বাক্স বন্ধ করিয়াছিলেন কি না ?

উ—না। তবে সাধারণতঃ আমি খুব সাবধানী। আর বিশেষ যখন বাক্সের ভিতর অত বেশী অর্থ ছিল, তখন অসাবধান হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্র—আপনার বাঙ্গালী সহযাত্রীর সঙ্গে কি রকম মাল আসবাব ছিল ?

উ—সামান্য একটি হাত-ব্যাগ। গাড়ী হইতে নামিবার সময় সে সেই ব্যাগটী হাতে করিয়া নামিয়াছিল।

এই সকল উত্তর হইতে একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কাশিম করিম সম্ভবতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। রাত্রে বাঙ্গালী বাবু তাঁহার টাকার থলিটি নিজের হাত-ব্যাগে ভরিয়া লইয়াছিল। হয়ত সে চাবি বন্ধ করিয়াছিল। অবসর বুঝিয়া বাবু কামিজের পকেট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়াছিল—বন্ধ করিবার সময় তাড়াতাড়ি আলতারাপ টেপে নাই। কিম্বা ট্রাঙ্ক সাধারণ—বাবুর নিজের চাবির থোকার একটা চাবি কলে লাগিয়াছিল। নিজের চাবির সাহায্যে সে দস্যুতায় সফলকাম হইয়াছিল। গালুডিতে সন্ধান করিলে বাবুর স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে, আর জানিতে না পারিলেও আমাদের তত ক্ষতি নাই।

কিন্তু সমস্যাটা ঠিক এইরূপ সহজ হইলে এস্থলে এত বিশদরূপে আমি ইহা বিবৃত করিতাম না। ইহার ভিতর দুইটা রহস্য ছিল, যাহাতে পোদ্দারের স্বুবর্ণ চুরির সহিত এ ঘটনার বিশেষ সংশ্রব ছিল। তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা আপনি যখন গাড়ীতে ছিলেন, তখন সেই বাবু ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিয়াছিলেন ?

অনেক চিন্তা করিয়া কাশিম করিম বলিল—কই না, আর কাকেও দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

আমি বলিলাম—আচ্ছা, কোনও সাহেব—কাফ্রি।

কাফ্রি শুনিয়াই সে বিস্মিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, মাঝে একবার গাড়ী থেমেছিল—কোনও ষ্টেশনে কি মাঠের মাঝে, তা বল্‌তে পারি না। তখন দেখেছিলাম, জানলা দিয়ে মাত্র একবার উঁকি মেরেছিল একটা কাফ্রি !

আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—কাজি। তাই বলিতেছিলাম, এ চুরির সহিত পোদ্দারের চুরির কতকটা সংশ্রব ছিল। আরও একটা সূত্রে দুইটা চুরির কাহিনী গ্রথিত ছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

-আবার পরিহাস-

বাটীর সম্মুখে ছোট বাগানে বসিয়া প্রফেসার সেন ও বন্ধু মিষ্টার রায় একটা সাঁওতালের সঙ্গে কথা কহিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সেন আনন্দ প্রকাশ করিল। আমি দিগ্বিজয় ও বসুদামকে দেখাইয়া বলিলাম কি প্রফুল্ল? এঁদের চিন্‌তে পার?

সে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, খুব পারি। সেই সময় বসুদামবাবু একটু তৎপর হ'লে—

বসুদাম আমার নিকট সে অপবাদ শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিল আবার সেই কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া একটু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল—কেন মশায়ও ত মনে কর্‌লে চোর ধর্‌তে পার্‌তেন! কাপুরুষ যে কেবল আমি একেলা—

প্রফুল্ল তাহার ভ্রমটা বুঝিল। অন্যত্র হইলে সে তর্কে পরাজয় স্বীকার করিত না। এক্ষেত্রে বসুদাম তাহার অতিথি, তাই, সে আত্ম-সংযম করিয়া বেশ একটু মোলায়েম ভাবে হাসিয়া বলিল—এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার? বসুন বসুন! ওরে বেটা ভোমা চেয়ার

আগুইমে। দাঃ ইউমিউ আগুইমে। (চেয়ার নিয়ে আয়। জলখাবার নিয়ে আয়)।

আমি বলিলাম—বাঃ, তুমি তো বেশ সাঁওতালী শিখেছ।

সে বলিল—ভোমা বেটা আমার বাড়ীওয়ালা মিঃ সুরেশ মিত্রিরের বাগানের মালী। আমার মাষ্টার। ভোমা উনিদো আপেদো হড়্ রড়্ শেঁড়া হোচোয় য়াম ? (এঁকে তোদের সাঁওতালী ভাষা শেখাবি ?)

ভোমা ভাবিল, অধ্যাপক তাহাকে পরিহাস করিতেছে। সে বলিল—আম্ মুতিয়াকাণা ? (ঠাট্টা করছ ?)

আমি তাহাকে বিস্মিত করিবার জন্য বলিলাম⋯ইন্ নাছে নাছে শেঁড়াই কেদাই। (আমি কিছু কিছু শিখেছি)

ভোমার বড় আনন্দ। ,স বলিল,—বাং বাং আমঝতঃ রড়্দো শেঁড়ায়া কেদাম্।। (না না, তুই সব কথা শিখেছিস্।)

সে চেয়ার আনিতে ছুটিল। প্রফুল্ল বলিল,—তুমি যেমন সাঁওতালী কথা ব'লে আমাকে বিস্মিত করলে, আমিও একটা সংবাদ দিয়ে বিস্মিত করব আজ তোমাকে।

আমি বিষয়টি জানিতে চাহিলাম। সে বলিল—আজ কাগজে পড়লাম, এই রেলে আর একটা চুরি হ'য়েছে। কাশিম করিম ব্যাপারীর—

—বিশ হাজার টাকা।

সে বলিল—হ্যাঁ ! বর্ণনা পড়ে যে রকম মনে হ'ল, তাতে বোধ হয় তার গাড়ীর দ্বিতীয় আরোহীটি এই অধীন। তবে লোকটাকে দেখলে—

আমি বলিলাম—তুমি? তুমি গালুডিতে নেমে গিয়েছিলে? হাতে একটা মাত্র হ্যাণ্ড-ব্যাগ?

সে বলিল—হ্যাঁ, সমস্ত বর্ণনাটা পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে সে আমারই গাড়ীতে বামড়া ষ্টেশনে উঠেছিল। নিশ্চয় সে লোকটা ফর্সা, কালো ট্রাঙ্ক—

আমি বিস্ময়ে অধীর হইতেছিলাম। কাশিম করিমের সহযাত্রী যে প্রফুল্ল সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। আমি বলিলাম—তুমি গালুডিতে নেমেছিলে কেন?

সে বলিল—ঘাটশিলায় ট্রেণ থামে না। রাত্রি হ'লে এলার্‌ম সিগনাল টেনে আস্তে আস্তে নেমে পড়া যায়—

সকলে হাসিল। আমরা পরস্পরকে আরও কতকগুলা প্রশ্ন করিয়া নিঃসন্দেহে জানিলাম যে, প্রফুল্ল সে রাত্রে কাশিম করিমের সহযাত্রী ছিল। তাই বলিতেছিলাম, পোদ্দারদের চুরির সহিত কাশিম করিমের চুরিটি একাধিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। সকলে বিস্মিত হইলাম। এমন যোগাযোগ তো সহজে ঘটে না।

আমি বলিলাম—তুমি জান না এ ব্যাপারে আরও একটু রহস্য আছে। কাশিম করিম সে রাত্রে সেই কাফ্রিটাকে দেখেছিল।

সকলে বিস্মিত হইল। রায় প্রফুল্লের মুখের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল। প্রফুল্ল একটু যেন অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। শেষে বলিল—কই আমি তো কাফ্রি দেখিনি।

আমি অশান্তির কারণটুকু উপলব্ধি করিলাম। কাফ্রিটা যে ছদ্মবেশধারী তস্কর, এ ধারণা সে বর্জ্জন করিতে একেবারে অসম্মত। আমি তাহাকে বলিলাম—হয়ত এ কাফ্রিটাও ছদ্মবেশ করেছিল।

সে উপহাসটুকু সহ্য করিল না। বিরক্ত হইয়া বলিল,—তা হতে পারে—হ'তে পারে কেন? সেইটাই নিশ্চিত। কিন্তু ছদ্মবেশী কাফ্রি—

আমি বলিলাম—এবিষয়ে আমরা একমত হ'তে পারব না।

সে বলিল—মোটেই নয়। কারণ সে কাফ্রিটা তোমার মানস পুত্র। তার লালন পালনের ভার তোমার নিজের।

আমি মনে মনে হাসিলাম। সেই আসল বা ছদ্মবেশধারী কাফ্রিকে ধরিতে পারিলেই দুইটা চুরিরই সন্ধান হয়, তাহা সে স্বীকার করিল না। আমার মনে কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। আমি তাহাকে আমাদের সদল বলে আগমনের উদ্দেশ্যটা বলিলাম। তাহাকে কল্যই আমাদিগের সহিত চক্রধরপুরে যাত্রা করিতে হইবে। সে স্বীকৃত হইল। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে তাহার সম্মতিই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া অন্য কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম।

—কিবা হাড়ি কিবা ডোম—

চক্রধরপুরের কোনও রেল কর্ম্মচারীকে আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করি নাই। কেবল আমার সব-ইন্‌স্পেক্টর রেলের সন্নিকটে একখানা বাংলা সংগ্রহ করিয়াছিল। আমরা সদলবলে বাংলা দখল করিলাম। সকলের পান ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া আমি সহরে জ্যাক বার্লীর সন্ধান করিতে গেলাম। শুনিলাম সে সন্ধ্যার পর বোম্বাই মেলে চক্রধরপুরে আসিবে।

চক্রধরপুরে তাহার বিষয় কতকগুলা সন্ধান পাইলাম। লোকটা খুব অধিক মাত্রায় মদ্যপান করে। রেল কর্ম্মচারীদের ক্লাবে সে জুয়া খেলে। তাহার জীবনের প্রধান উপাস্য আপাততঃ একজন ফিরিঙ্গী রমণী, মিসেস্ বার্ক—একজন গার্ডের বিধবা। বয়স আন্দাজ ৩২ বৎসর, কিন্তু দেখিলে তাহাকে অষ্টাদশী বলিয়া ভ্রম হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ অতি আধুনিক, খুব শিল্পী ধরণের। শুনিলাম চক্রধরপুর রেলওয়ে ডিষ্ট্রীক্টের ছোট বড় সকল ফিরিঙ্গী সাহেব তাহার প্রসাদলাভে লালায়িত। কিন্তু দুর্নিবার মন্মথর এমন বিচারশক্তি যে কালো মুস্কো জ্যাক বার্লী ব্যতীত কেহ তাহার প্রণয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। সত্যই কবি বলিয়াছেন—

রূপে মনোহারিণী যৌবনে চ
বৃথৈব পুংসামভিমান বুদ্ধিঃ।
নতদ্ধ্রুবাং চেতসি চিত্তজন্মা
প্রভুর্য্যদেবেচ্ছতি তৎ করোতি।

তাহার বাটীর আশেপাশে ঘুরিলাম। বাংলার সম্মুখে বাগান। নানাপ্রকার মরসুমী ফুল হাসিতেছে, বাগান হইতে বাংলায় উঠিবার বেশ প্রসস্ত সিঁড়ী। সেই সোপানে দুইটি লোক পাশাপাশি যাইতে পারে, এমন স্থান রাখিয়া দুই দিকে চীনামাটির টবে মেমসাহেব অনেক বিলাতী তালবৃক্ষ সাজাইয়া রাখিয়াছে। বারান্দার ঝিলিমিলিতে অর্কিড্ ঝুলিতেছে, বারান্দায় প্রবেশ করিবার দুইটি পথ জাপানী চিক্ দিয়া বন্ধ। মাঝের গমনাগমনের পথে ফাঁপা কাঁচের চিক্ মৃদুমন্দ মলয়স্পর্শে দুলিতেছে, আর অতি মৃদুশব্দ করিতেছে। আপনারা ক্ষমা করিবেন ; আমি কবিত্ব-শক্তিহীন

পুলিস কর্ম্মচারী, বর্ণনাবিদ্যায় আমি একবারে অজ্ঞ। কিন্তু নিঃসন্দেহ পুলিসের লোকেরও মনের নিভৃত অন্তস্তলে একটা কবিতার সুরে বাঁধা তার আছে—বাহিরের কবিতার ঝঙ্কার শুনিলেই সাড়া পাইয়া সে সুরে বাজিয়া উঠে। এক্ষেত্রে মিসেস্ বার্কের শান্ত শ্যামল কুটীরের পারিপাট্য দেখিয়া আমার প্রাণে প্রথমে সেই তার বাজিয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই খুব মোটা সুরে বাঁধা আর একটা যন্ত্র বাজিয়া উঠিল—সেটা ঢাকের মত। সন্দেহ এবং মানবপ্রকৃতির প্রতি অবজ্ঞায় সেবাদ্য-যন্ত্রটা গঠিত, আমাদের শ্রেণীর লোকের প্রায় সারা প্রকৃতি জুড়িয়া সেই সুরের আমেজ বিরাজিত। সেই ঢাক বাজিয়া উঠিল—হুঁঃ! সামান্য গার্ডের বিধবা, সামান্য জুয়াড়ী মাতাল কাফ্রির প্রণয়িনী আইভি বার্কের এমন বিলাসিতা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় কে? এ স্বাচ্ছন্দ্য চুরি না করিলে উপভোগ করিতে পারা যায় না। তাহার সেই শান্ত আশ্রম খানাতল্লাসী করিলে যে অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে, সে ধারণাও আমার হৃদয়ে জমাটবদ্ধ হইতেছিল।

গৃহে বসিয়া আইভি পিয়ানো বাজাইতেছিল। তাহার গৃহের সাজ-সরঞ্জাম যে বড় উচ্চদরের তাহা আমি কল্পনা করিতেছিলাম। বাংলার পিছনে শ্যামল টেনিস-ক্ষেত্র যেন হরিৎ বর্ণের বহুমূল্য বিস্তৃত কার্পেট। একজন বড় যোদ্ধা লণ্ডনের পায়রার খোঁপের মত অসংখ্য অট্টালিকা দেখিয়া বলিয়াছিল—অবরোধ করিয়া গোলা ছুঁড়িবার কি আদর্শ নগর। আমারও সেদিন আসুরিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, খানাতল্লাসী করিবার কি আদর্শ কুটীর। আমি টেবিল, চেয়ার, খাট-বিছানা, আলমারী-ডেস্ক, ছবি, পরদা, কার্পেট, তেপায়া উল্টাপাল্টা নাড়াচাড়া করিবার কল্পিত আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম—আর যদি অপহৃত সম্পত্তির কোনও অংশ তাহার বাক্স

সিন্ধুকের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে তো আনন্দের সীমা থাকিবে না। হয়ত তাহার নিজের চারুহস্ত-রচিত পুষ্পবাটিকার কৃত্রিম শৈলেব পাথরের নীচে সুবর্ণ ইষ্টক লুক্কায়িত আছে।

কিন্তু আমার প্রধান সাক্ষ্য ও পরামর্শদাতার নিকট যখন আমি এ সকল কথা বলিলাম, সে পুলিসের উপর একটা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল - আমি ত "ঘোটকীর নীড়" আবিষ্কার করিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম—আমি যে স্বচক্ষে এ সব দেখে এসেছি।

সে বলিল—ক'টা গাছ পুঁতেছে আর ফুল ফুটিয়েছে ব'লে কি তার কুবেরের ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক হ'য়েছে না কি?

আমি বলিলাম—তোমার সঙ্গে তর্ক করা—

সে বলিল—তর্ক কেন? সোজা হিসাব। সখ আছে বাগান ক'রেছে। একটু একটু করে খেটে এক একটা করে গাছ জোগাড় করেছে। পিয়ানো আগে কিনেছে। এটা জান কি, যে বাবুদের পক্ষে সাহেবীয়ানা করতে যত খরচ হয়, সাহেবদের পক্ষে সেইরকম সাহেবীয়ানা অনেক কম খরচে হয়।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, কিন্তু কতকটা টাকা না থাকলে কি আর—

এবার তাহার মুখ উজ্জ্বল হইল, চক্ষে জ্যোতিঃ দেখা দিল, সে সত্য আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল, সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—হ্যাঁ! আসল কথাটা এতক্ষণ কারও মনে পড়েনি। বার্ক গার্ড ছিল না?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ!

সে বলিল—তবে! প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাগুলা কি হ'ল। রেল

কর্ম্মচারী মরলে তার ওয়ারিশরা যে টাকা পায়, সেই টাকা নিয়ে আইভি খুব আরামে আছে।

আমি একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম,—তোমার বুদ্ধি ভাল না, তা' হ'লে সে কাফ্রিটার সঙ্গে প্রেম—

প্রফেসার হাসিয়া বলিল—ওদিকে পুলিসের বুদ্ধি চালিয়ো না। সে বিষয়ে অনেক নজীর আছে—আমাদের দেশের "কিবা হাড়ি কিবা ডোমের" ছড়া থেকে শেক্সপীয়ারের ওথেলো-ডেস্‌ডিমোনা অবধি হাজার হাজার নজীর আছে।

আমি বলিলাম—সাহিত্য পড়লে যদি চোর ধরা যেত ত'াহলে ভাবনা থাকৃত না।

—জ্যাক বার্লী—

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়াছিল। আমি প্রফেসার সেনের সহিত দাবা খেলিতেছিলাম। পোদ্দারদ্বয় ভোজনান্তে নিদ্রা যাইতেছিল। সন্ধ্যায় সময় বোম্বাই মেলে গুজরাটী বণিক কাশিম করিমও আসিয়া জুটিয়াছিল। সে বারান্দায় একখানা চারপাই বিস্তার করিয়া নিদ্রাদেবীর শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। রায়সাহেব কোথায় ছিল জানি না। সে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইবার অনুমতি পাইয়াছিল। দুইটি বন্ধুর বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনেকটা এক প্রকারের, তাই উভয়ের এত ঘনিষ্ঠতা।

সেন আমার কালো ঘরের গজটিকে তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় মাঠ হাসিতেছিল। সে এক একটা ভাল চাল দিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত হরিত ক্ষেত্রের দিকে তাকাইতেছিল। আমার গজ ধরিবার জন্য ঘোটককে আড়াই পদ চালিয়াই সে সগর্ব্বে মাঠের দিকে তাকাইল। তাহার পর আমার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া আমাকে ময়দানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিল। আমাদের বাংলার বাহিরে দশ-বার হাত দূরে একটা কাফ্রি দাঁড়াইয়া চুরুট ধরাইতেছিল। আমার হৃৎকম্প হইল। দেহের মধ্যে শোণিত-প্রবাহ বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম – বার্লী!

সে বলিল,—চুপ্! গোল ক'র না আমি বাইরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা কই। তুমি সাক্ষীদের ডেকে দেখাও। আমার কোন সন্দেহ নাই। ঐ লোকটা সোনা চুরি করেছে।

কি আনন্দ! চোর ধরা পড়িয়াছে! ধারণা ঠিক হইয়াছে! হিসাবে কোন ভুল নাই। বাঃ! বড় গর্ব্বিত হইলাম; বন্ধুকে বলিলাম— ও আর যাবে কোথা? সন্দেহ হ'লে পালাবে, তুমি কাছে যেও না।'

সে বলিল—ননসেন্স। তাতে কি হয়েছে?

আমি বলিলাম—যদি তোমায় চিনতে পারে?

সে বলিল –তার সম্ভাবনা নেই আটক করা চাই।

সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া লোকটার সঙ্গে বাস্তবিক কথা কহিতে লাগিল। আমি পোদ্দার দুইজনকে ডাকিলাম, তাহারা দেখিয়াই চিনিল। দিগ্‌বিজয় কাঁপিতেছিল। বসুদামের ততোধিক উত্তেজনা।

কাশিম করিমকে ধীরে ধীরে তুলিলাম। সে বলিল—হ্যাঁ—ঐ রকমের কাফি একটা দেখেছিলাম—হ্যাঁ ঐ বটে—না। ঠিক ওই—বেশ মনে পড়েছে।

সেন যখন বুঝিল যে, আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তখন সে গুড্ নাইট বলিয়া লোকটাকে বিদায় দিল। আমার কাছে আসিয়া বলিল—কি এখনই ধরবে নাকি?

আমি বলিলাম—কি দরকার? কাল সকালে ষ্টেশন থেকে সাক্ষী রেখে পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে তোমাদের দিয়ে চেনাব। তাতে আমার মামলা শক্ত হ'বে।

সে বলিল—সে বিচারের ভার তোমার উপর, আমি ও সব বুঝি না। তবে দৈব-বলে আসামীটা দেখতে পেয়েছে।

আমি বলিলাম—দৈব বল কি? সমস্ত হিসাব করে করেছি। তুমি ত গোড়া থেকে উড়িয়ে দিয়েছিলে।

সে বলিল—যাক্। তবে ঐ লোকটা যে পোদ্দারদের সোনা নিয়ে পালিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমি বলিলাম—নামটা জিজ্ঞাসা করেছ?

সে বলিল—হ্যাঁ, জ্যাক্ বার্লী। তবে ও সত্যি জ্যাক্ বার্লী কি মিঃ রায়—

শেষ পরিহাসটা হইল বয়িকে দেখিয়া। ঠিক সেই সময় রায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার নাম উচ্চারিত হইতেছে শুনিয়া সে বলিল—কেন মিঃ রায় কি করেছে?

আমি তাহাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম—সে আনন্দে বালকের মত

হাসিতে লাগিল। অভিনন্দন করিল করমর্দ্দন করিয়া আমার হাতে ব্যথা করিয়া দিল। সেনের একটা ভদ্রতা দেখিলাম। সেটা শিক্ষিত লোকের সুলভ। সে সরল অকপট চিত্তে আনন্দ প্রকাশ করিল, আমার নিকট বুদ্ধিতে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া কোনও প্রকার শ্লেষ প্রকাশ করিল না। প্রভাতে কিরূপে তাহাকে ধরিব সে সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়া পদ্মনাভকে স্মরণ করিল কিনা জানি না, কিন্তু শয়ন করিয়া অচিরে নিদ্রামগ্ন হইল। আমার পুলিস-কর্ম্ম-দৃঢ় মনে নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল।

—সনাক্ত—

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জ্যাক বার্লীর সন্ধান পাইলাম না। বিরক্ত হইলাম কিন্তু হতাশ হইলাম না। আরও দুইদিন চক্রধরপুরে অপেক্ষা করিলাম। শুনিলাম সে রেলের কার্য্যে বোম্বাই গিয়াছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে। যে রাত্রে তাহাকে দেখিয়াছিলাম সেই রাত্রেই নাকি তাহার উপর বোম্বাই যাইবার আদেশ হইয়াছে। কিন্তু সে রাত্রে কেহ তাহাকে চক্রধরপুরে দেখে নাই —যে সময় আমরা তাহাকে দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই সময় সে একখানা মালগাড়ীতে আসিয়াছিল—মিসেস্ বার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইবার জন্য। যাহা হউক, আর সেখানে সদলবলে থাকিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম না। সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলাম।

সেনের কলেজ খুলিয়াছিল। প্রায় পনের দিন হইল, সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে। পোদ্দারদ্বয়কে চুঁচুড়া হইতে সংবাদ দিয়া আনাইলাম। কাশিম করিমকেও আমড়াতলায় পাইলাম। রেলওয়ে পুলিস জ্যাক বালীকে ধরিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশনে তাহার মত আরও নয়জন ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান জোগাড় করিয়া সকলকে এক লাইনে দাঁড় করাইলাম। ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি তিন চারিজন সাহেবকে সাক্ষ্য করিবার জন্য সেস্থলে বসাইলাম। আমার সাক্ষীদের প্রথমে একটা ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাল।

প্রথমে সেনকে ডাকিলাম। সাহেবদের সম্মুখে বলিলাম—যে ব্যক্তি ট্রেণে সোনার থান চুরি করিয়াছিল সে ব্যক্তি এখানে আছে কি না দেখুন।

পাগলা মাষ্টার সেই দশজন কৃষ্ণকায় সাহেবের মুখের দিকে একে একে চাহিল। তাহার পর লাইনের একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত চলিল, আবার ফিরিল। মুখে একটা নির্ব্বোধের মত ভাব—শেষে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—না। এ উত্তেজনায় আমি অধৈর্য্য হইতেছিলাম—কাফ্রিগুলা ও আমার ফিরিঙ্গী সাক্ষীগুলা পরিহাস করিয়া হাসিতেছিল, ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। কি পাগল! বোধ হয় আমার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া সে এরূপ আচরণ করিতেছে। আমি তাহাকে আবার দেখিতে বলিলাম—সে এবার বলিল—সে লোক এখানে নাই—। সকলে হাসিল। আমি জ্যাক বালীকে দেখাইয়া বলিলাম—দেখুন ত এ লোককে কখনও দেখেছেন কি?

সে বলিল—জীবনে কখনও ইহাকে দেখি নাই।

বালী তাহাকে মাথা নীচু করিয়া সম্মান করিল বলিল—মহাশয় ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

তাহাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিগ্বিজয় পোদ্দারকে ডাকিলাম। সেন পাগলামি করিয়াছে। ইঁহার সম্পত্তি চুরি গিয়াছে ইনি আমার প্রতি ঈর্ষা করিয়া আমার মোকদ্দমা নষ্ট করিবেন না। তাঁহাকে বলিলাম—যে লোক আপনার সোনা চুরি করেছে সে এস্থলে আছে কি না দেখুন।

আঃ! কি নির্ব্বোধ! ছিঃ! ছিঃ! আমাদের ব্যবসাদারগুলা এইরূপ অকর্ম্মণ্য বলিয়া বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এত মন্দ। এ লোকটাও কি পাগল না কি! আঃ! ঠিক বালীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ দেখিয়া পাশের লোকটার দিকে চাহিল। আ—রেঃ গেল! লাইনের শেষে। আবার ফিরিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বালল—না এখানে নাই।

কী বিড়ম্বনা! সকলে হাসিল, যার চুরি গিয়াছে সে যদি নিজের স্বার্থ না বোঝে আমার কি? যাহা হউক, একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। আমি তাহাকে জ্যাক বার্লির সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম—দেখুন দেখি ইহাকে জানেন?

সে বলিল—না।

—চক্রধরপুরে আমাকে দেখিয়েছিলেন কাকে? মাঠের উপর জ্যোৎস্না রাত্রে?

—সে সেই চোরটাকে। এ অন্য লোক।

মনে মনে বলিলাম— তোমার মাথা।

সে বালীর ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া বসিল। বসুদামও 'বাঁশবনে ডোম কাণা' হইল। কাশিম করিমও তদবস্থ!

ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। কাফ্রিটা শিকার দিতেছিল। আমার ইন্‌স্পেক্টর, সবইন্‌স্পেক্টর, জমাদারগুলা আমার প্রতি চাহিয়াছিল। এমন দুর্গতি কখনও হয় নাই। নিশ্চয় আমাকে অপমান করিবার জন্য সকলে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

আমি জ্যাক বার্লীকে মুক্তি দিলাম। রিপোর্টে লিখিলাম—এ মামলার সাক্ষীগণ আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। এ তদন্তে আর কোনও ফল হইবে না। তদন্ত বন্ধ হউক।

—নির্ম্মলকান্ত—

ছয় মাস প্রফেসার প্রফুল্ল সেনকে দেখি নাই, তবে মাঝে মাঝে তাহার কথা স্মরণ করিতাম, আর সেই চুরী দুইটার কথা মনে পড়িলে একটা কঠোর আত্মগ্লানিতে জ্বলিয়া মরিতাম। সে রাত্রে কেন কাফ্রিটাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিলাম না? অধিক বিচার বিতর্ক করিতে গিয়া এরূপ ভাবে হাতের শিকার পলাইয়াছিল। জ্যাকবার্লি যে সে লোক নয়, তাহা অস্বীকার করিবার আমার শক্তি নাই, কারণ উত্তেজনায় সে লোকটাকে উত্তমরূপে সে রাত্রে দেখি নাই; কিন্তু লোকটা গেল কোথা? আমি শেষ রিপোর্ট দিয়া তদন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু একজন স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম যে, চক্রধরপুরে বা তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দ্বিতীয় কাফ্রি দেখিলে

আমাকে সংবাদ দিবে। এতাবৎ কাল সে জ্যাকবার্লি ব্যতীত অন্য কাফ্রির সন্ধান পায় নাই।

যখন রাত্রে ভোজনের পর এই সব কথা লইয়া তোলাপাড়া করিতেছি, তখন অকস্মাৎ মিঃ প্রফুল্ল সেন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদেব শেষ মিলনটা তত সুখের হয় নাই, তাই তাহার উদারতায় আমি একটু বিচলিত হইলাম। তাহাকে একটু অধিক প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কস্মিন-কালেও নির্দ্বন্দ্ব নয়। সে বলিল—কি হে, তদন্তটা একেবারে ছেড়ে দিলে?

আমি জোড় হাত করিয়া বলিলাম,—আর কেন ভাই ও সব কথা? যেতে দাও না।

সে বলিল—না না, আমি আজ তোমাকে যদি নিশ্চয় চোরের সন্ধান না দিই, তাহ'লে—

আমি বলিলাম—ক্ষমা কর না ভাই, আর কেন সে কথা—

সে বলিল—কি মুস্কিল!

আমি বুঝিলাম, এই ছয় মাসে সে একটা কিম্ভূতকিমাকার থিওরি সৃষ্টি করিয়াছে। থিওরিটি আমার মস্তকে তর্কের দ্বারা প্রবেশ করাইবার জন্য আসিয়াছে। আমি বলিলাম,—ভাই বুঝেছি, মনখানেক থিওবি নিয়ে এসেছ।

সে বলিল—থিওরি কেন? চোর ধরে এনেছি। এখনি যদি চোব ধরিয়ে দিই? ত'হলে কি আর এমনি ধূলো-পায়ে বিদেয় দেবে। একটু ধৈর্য্য ধ'রে শুন্‌তে দোষ কি?

আমি তাহার মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

বাস্তবিকই পাগলা মাষ্টার। ভীষণ পাগল! চোর ধরিয়া আনিয়াছে? লোভে প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। উত্তেজনায় চক্ষু দুইটা জ্বালা করিতেছিল। বিধিমতে মনকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলাম। পাগলের প্রলাপে আশার বাসা বাঁধিয়া শেষে কি নিরাশ হইব?

সে বলিল—সত্যই আজ চোর ধরিয়ে দেব। একবার কিন্তু আমার কথাগুলা স্মরণ কর। দেখবে আমার কথাগুলা সব সত্য, তোমার সব ভুল।

আমি বলিলাম—বেশ, ভাল কথা। এখন দয়া করে অন্য কথা কও। আর যদি পকেটে বা ট্যাঁকে কোথাও চোর থাকে তাকে বার করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধ। কিন্তু আর থিওরি প্রহার—

সে বাধা দিয়া বলিল—না থিওরি না। সত্য খাঁটি একের নম্বরের সত্য। এই প্রথমে পোদ্দারদের কেস্‌টা ধর। আমি বলেছিলাম যে, চুরী হয়েছিল ছদ্মবেশী কাফ্রির দ্বারা—চোর গুলি ছুঁড়েছিল, মারবার জন্য নয়, সে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করেছিল গাড়ীর এলারাম সিগ্‌নাল টানার জন্য। সিগ্‌নাল টানার পর ধীরে ধীরে নেমে গাড়ীতে উঠে ছদ্মবেশ বদলেছিল—কেমন।

আমি কি করি? সে তো না শুনাইয়া ছাড়িবে না। কাজেই হতাশ ভাবে বলিলাম—বেশ।

সে বলিল—আচ্ছা! পাশেই একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী ছিল। বুঝিতেই পার ফার্ষ্টক্লাসের যাত্রীর সাতখুন মাপ। কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। বেশ! সেই যাত্রীর একটা কাফ্রির মুখোস আছে মাত্র। সে টানেলের আগের ষ্টেসনে আস্তে আস্তে অন্ধকার

গাড়ীতে এসে ল্যাভেটারীতে লুকিয়ে রইল। টানেলের কাছে এসে আলো জ্বেলে চুরি করলে, বন্দুক ছুঁড়লে, আলো নিভিয়ে গাড়ীর বাহিরে গেল। ট্রেণ থামলে ধীরে ধীরে নিজের প্রকোষ্ঠে চলে গেল। মুখোসটা খুলে ফেললে আর সোনার ইটগুলা যেখানে সন্দেহ হবে না, খুব সাধারণ ভাবে একটা বিছানার মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে। সে যদি সাহেবী পোষাক পরে থাকে, কেহ তার বিছানা খুঁজবে না। আর যদি খোঁজ আরম্ভ হয় তো তার ঘর আগে খানাতল্লাস হ'বে না। বেগতিক বুঝে সে তালটাকে কমোডের ভিতর দিয়ে ফেলে দেবে। ধরা পড়লেও ভয় নেই, চোবে ফেলে গেছে। কেমন বুঝলে ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, জলের মত। এখন অনুগ্রহ ক'রে অন্য কথা কও।

সে বলিল—কেমন ? যে কথা বললাম, তাতে কোনো যুক্তির দোষ আছে ?

আমি বলিলাম—না, বিশেষ কিছুনা। তবে ফার্ষ্ট ক্লাসের লোকটার পক্ষে ঠিক জানা শক্ত যে, কি মাল আছে, এবং গাড়ীতে উঠবার সময় তিন জনের মধ্যে কেহ জেগে আছে কি না ?

সে বলিল—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ ! তোমার মাথা আছে। তবে কেন চোর ধরতে পার না ? ঠিক কথা। আচ্ছা, যদি গাড়ীতে তার একজন বন্ধু থাকে ?

আমি বলিলাম—এক্ষেত্রে সে রকম বন্ধু তো দেখিনি। পোদ্দার দু'জন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত। তৃতীয় ব্যক্তি তুমি—

সে বলিল—আচ্ছা, আমি যদি বন্ধু হই, তা'হলে আমার থিওরি

সম্ভবপর হ'তে পারে। আমার দিকে গুলি ছোঁড়ায় 'ঝিকে মেরে বৌকে শিক্ষা' দেওয়া হ'ল। আমারও লাগল না, পোদ্দাররাও ভয় পেলে। দ্বিতীয় কথা, আমি চেন টানায় তবে লোকটা পালাতে পারল কেমন ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, তুমি যদি চোরের সঙ্গী হও, তা' হ'লে হ'তে পারে।

সে বলিল—বেশ কথা। আচ্ছা, দ্বিতীয় কেস্‌টা নাও।

আমি কি করি ? থিওরিটা না শুনিলে রক্ষা নাই, সে ছাড়িবার পাত্র নয়। আমি বলিলাম—নাও।

সে বলিল—আমি শুয়ে আছি। সঙ্গের বন্ধুটি কাফ্রি সেজে একবার হানা দিয়ে গেছে। কাশিম চাবি বন্ধ করতে ভুল করেছে। ধীরে ধীরে পলেটা চুরি করেছি। গালুডিতে নামবার আগে যদি সে চুরীর কথা জানতে পারত, তা হ'লেও আমাকে ধরতে-ছুঁতে পারত না। কেন বল দেখি ?

আমি বলিলাম—মাল তোমার কাছে নাই, কাফ্রির হাত দিয়ে পাচার করেছ। আর তুমি পদস্থ ব্যক্তি।

সে বলিল—বেশ কথা। এখন বোঝ, পদস্থ ব্যক্তি যদি চুরি করে, আর লোকে যদি নিজের পদার্থ সম্বন্ধে সাবধান না হ'তে পারে, তাহ'লে কারও রক্ষা নাই। পুলিশের সুযশ অপযশ সব বাজে।

আমি অগত্যা বলিলাম—নিশ্চয়।

সে বলিল—আর একটু কথা আছে। চুরিটা যত সোজাসুজি করবে, তত ধরা না পড়বার সুবিধা। চোর ধরা পড়ে পালাতে গিয়ে, হাঁকুপাকু করে।

আমি বলিলাম—তাও জলের মত বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলাম না। পদস্থ লোক চুরি করবে কেন?

সে বলিল—আঃ! এই খানেই সমস্যা! পদস্থ লোক চুরি করবে কেন? হ্যাঁ, কেন পদস্থ লোক চুরি করবে?

আমি বুঝিলাম এ প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তত ছিল না। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়াই বলিল—চুরি করবে কেন? দেশের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। চারিদিকে সোনা ছড়ান আছে। কিন্তু সে সোনা বিদেশীরা নিয়ে যাচ্চে কেন? আমাদের টাকা নেই বলে। আচ্ছা, যদি এমন একটা বাণিজ্য সমিতি হয়, যাদের সভ্যেরা এই রকমে অর্থ সংগ্রহ করবে, শেষে সেই অর্থ দিয়ে কারখানা খুলবে, তাহ'লে এরূপ চুরিতে দোষ আছে?

আমি বলিলাম—চুরিতে দোষ আছে কি না, সে কথার জবাব দিতে পারে তোমার মত নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। তবে যাদের যায়, তাদের অবস্থাটা—

সে বলিল—হ্যাঁ, এটা কথা বটে। কিন্তু যাদের যায় তারা যদি খুব ধনী হয়, আর তাদের দ্বারা যদি অর্থের সদ্ব্যবহার না হয়? এ-ক্ষেত্রে ধর আমি জানি পোদ্দার দুজন আর কাশিম করিম—

আমি বলিলাম—ভায়া, যেতে দাও, একথায় লাভ কি? চোরকে তো চক্রধরপুরে দেখেছিলাম। সে চোর তুমিও নও, তোমার শ্রম-শিল্প সমিতির অপর সভ্যও না।

সে বলিল—বেশ! যখন চোর এসেছিল, আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা কহেছিলাম? তারপর চোর কোথা গেল? জ্যাক বার্লীকে নিয়ে কতই কেলেঙ্কারী করলে?

আমি তাহার কথার ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার বক্তব্যটা কি? সে কি বাস্তবিকই ব'লতে চাহে সে চোর? বেশ কথা, তাই বলুক তাহাকে ধরি। সে বলিল—চোরকে আনি?

একেবারে উন্মাদ! কি বিপদ! এ আসল পাগল! ধীরে ধীরে সে বাহিরে গেল! পরক্ষণে ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে চক্রধরপুরের সেই—কাফি্।

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কী বিভীষিকা! সমস্ত ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে কাফি্টা নিজের মাথার চুল ধরিয়া টানিল। সমস্ত মুখটা যেন খসিয়া গেল। দেখিলাম প্রফেসার-বন্ধু রায়।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই বাহির করিয়া মুখোসটাতে আগুন লাগাইয়া দিল। বোধ হয় তাহাতে কোনও রাসায়নিক পদার্থ লেপিত ছিল। নিমেষমধ্যে সেটা পুড়িয়া গেল। আমার ঘরের কোনে কোনে কতকটা ছাই উড়িতে লাগিল। রায় হাসিয়া বলিল—প্রকৃতিস্থ হ'ন, বসুন।

সেন বলিল—কেন মুখোসটা পোড়ালাম বল দেখি? ওটা ভিন্ন আমাদের বিপক্ষে কোন সাক্ষী নাই। এখন আমাদের যদি তুমি ধর তো কিছু হ'বে না। অবশ্য সোনার ইট্ আছে। তা' সে সনাক্ত হ'বে না, আর কেহ খুঁজেও পাবে না। ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেচেছি।

রায় বলিল—বলুন দেখি কাজটা কেমন "নিটলি" করেছি। চক্রধর-পুরে যদি ছুটে এসে ধরতেন তো বলতাম ঠাট্টা করছিলাম।

পাগলা মাষ্টার বলিল—মাত্র ৬০ হাজার হ'য়েছে। অপরে আরও করচে। যাক্ শিল্পের জন্য চুরিও করছি।

দু'জনে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। হাত পা বাঁধা—তাহাদের তস্কর জানিয়াও ধরিবার উপায় নাই। রিপোর্ট করিয়াই বা লাভ কি? সাত-পাঁচ-ভাবিয়া বলিলাম—"চুলোয় যাক্।"

তৃতীয়-পালা

—পাখীর খাঁচা—

এ-ইতিহাস যে কালের—সে সময়ে আমি ছিলাম দারোগা। অবসর লইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম।

আমি হাসিতাম, আমার সহধর্ম্মিণী হাসিতেন। কি আপদ! আমাদের পল্লীগ্রামে কেহ ওগুলার দিকে তাকায় না। কিন্তু আমাদের বাসার পার্শ্বে গফুর খাঁ রাজ্যের গাঙ্‌শালিখ্‌, নেকড়ে শালিখ্‌, পাউই, হোরেল প্রভৃতি অতি সাধারণ শ্রেণীর পাখী আনিয়া সেগুলিকে খাঁচায় ভরিয়া রাখিত। আর খাঁচারই বা বাহার কত! কেহ গোল, কেহ চারচৌক, কাহারও চূড়া মন্দিরের মত। প্রত্যেকটির নীচে এক একটা সৌখীন হাতল-লাগান টানা—সেগুলা টানিয়া পিঁজরা পরিষ্কার করা যায়, পক্ষীদের আহার্য্য সরবরাহ করা যায়। আমাদের প্রতিবেশীর চিড়িয়াখানায় দুই একটা কাকাতুয়া, ময়না, লালমোহন প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পিঁজরা বা দাঁড়ের অত চটক ছিল না। সে পাখীগুলা গফুর খাঁর নিজস্ব! তাহারা বারো মাস তাহার বাটীর সম্মুখে সাজান থাকিত, অতি যত্নে প্রতিপালিত হইত। কিন্তু শালিখ বুলবুলির পাল চালান হইত। শুনিয়াছিলাম পাঁচ বৎসর পাখীর ব্যবসা করিয়া গফুর খাঁয়ের এত ঐশ্বর্য্য।

লোকটা বাঙ্গালী মুসলমান—অশিক্ষিত লোক ধনবান হইয়াছিল, তবু শিষ্টাচার বিস্মৃত হয় নাই। আমি অল্পদিন মাত্র কলিকাতায় শরীর সারিতে আসিয়াছিলাম। তাহার বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বে ২৭৲ টাকা ভাড়ার এক ক্ষুদ্র বাসার বাসিন্দা ছিলাম, তবু লোকটা আমায়

যথেষ্ট সম্মান করিত। আমার ভৃত্য, খোকাকে তাহার বাটীতে পাখী দেখাইতে লইয়া গেলে সে নিত্যই তাহাকে উপহার দিত—কোনও দিন খেলনা, কোনও দিন ফল, কোনও দিন মিষ্টান্ন।

আমি মাথায় কাণে গলায় পশমের গলাবন্ধ তাহার উপর শাল জড়াইয়া, হাতে ঝাল্‌দার মোটা বাঁশের লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে গোলদীঘিতে প্রভাতী বায়ু সেবন করিতে যাইতেছিলাম। গফুর খাঁ দরজার সম্মুখে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া একটা চীনার সহিত কথা কহিতেছিল। আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া সেলাম করিল। আমি সেলাম করিয়া বলিলাম—'খাঁ সাহেব আপনি আমার ছেলেটিকে মাটি করবেন। রোজ তাকে অত জিনিসপত্র"—

আমাকে বাধা দিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া গফুর খাঁ বলিল—"ছিঃ ভানুবাবু, ও কথা বলবেন না। আপনার ছেলে আমার গরীব খানায় আসে, আমার সৌভাগ্য।'

আমি আর জিদ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম খোকার যাওয়া বন্ধ করিব। কিন্তু ছেলে বড় পাখী ভালবাসে। খাঁ সাহেবকে বলিলাম—ছেলেটা ভারী পাখী ভালবাসে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কি না।

সে বলিল—আঁজ্ঞে হ্যাঁ তা জানি। আমি খোকা বাবুর জন্যে দুটো পাখী পাঠিয়ে দ'ব এখন।

আমি বলিলাম—না না; তা করবেন না। ও দেখে যাবে এখন। আর আপনার যেসব পাখী, আমাদের মফস্বলে ওগুলোকে কেউ কষ্ট করে ধরে না।

গফুর খাঁ হাসিয়া বলিল—আঁজ্ঞে তা জানি। কিন্তু আমি এদেরই

দৌলতে এক মুঠা খেতে পাচ্চি। এই একটা শালিকের বাচ্ছা চার পয়সা ছ' পয়সায় কিনি আর দশ টাকায় বেচি। খাঁচা, জাহাজ ভাড়া সব নিয়ে পাঁচ টাকা পড়ে। প্রত্যেক শালিখে নিট্ পাঁচ টাকা লাভ।

পাখীগুলা চালান হইত জানিতাম। কিন্তু সেগুলা যে অত দূরে বিক্রয় হইতে পারে আমার সে ধারণা মোটেই ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম – বলেন কি? কোন্ দেশে এদের এমন কদর?

সে হাসিয়া বলিল—আপনি আর কিছু এ ব্যবসা করছেন না। আপনাকে বলতে দোষ নেই। এই আফিমখোরদের দেশে।

সে চীনাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। চীনবাসী হাসিয়া আমাকে তর্জ্জনী দ্বারা সেলাম করিল। চীন দেশ সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা করিতে করিতে আমি আমার "প্রভাতী ভ্রমণে" চলিলাম।

দুই চারিদিন পরে গোফুর মিঞা পিতলের দাঁড়ে কাকাতুয়া পাঠাইয়া দিল। আমার কোন কথা শুনিল না। খোকার বড় আনন্দ, সহধর্ম্মিণী মুখে দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে বড় খুসী। উপহার পাইলেই স্ত্রীজাতির আনন্দ। গফুর খাঁর দুইটা ভাল মুলতানি গাভী ছিল। সে এক এক দিন আমাদের দুধ পাঠাইয়া দিত। পরে শুনিয়াছিলাম—তাহার তিনটী স্ত্রী, কিন্তু প্রত্যেকটিই বন্ধ্যা। তাই অপুত্রক গফুরের সহিত আমার খোকার অত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

গফুর খাঁর নিকট নানা প্রকারের লোক আসিত। আমি পুলিসে কার্য্য করিতাম, অবশ্য গফুর তাহা জানিত না। আমি শুনিয়াছিলাম পুলিসের লোক প্রতিবাসী হইলে কলিকাতার লোক বড় সন্দেহের

চক্ষে দেখে। তাই কাহাকেও আত্ম-পরিচয় দিই নাই। আমার পুলিশ-কার্য্যের অভিজ্ঞতার বলে মনে হইত যে, যে গফুর খাঁর নিকট যত লোক আসে প্রত্যেকটিরই চরিত্র যেন সন্দেহজনক। বলিতে লজ্জা করে, গফুর খাঁ সম্বন্ধেও আমার মনে কেমন একটা অভদ্রোচিত সন্দেহ হইত। চীনদেশের লোক সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, মলয় দেশের দ্বীপপুঞ্জের কাকাতুয়া, লালমোহন, হীরামোহন প্রভৃতির আদর না করিয়া বাঙ্গালা দেশের শালিখ পাখার এত কদর করে কেন? কথাটা যেন কেমন অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। কিন্তু গফুর খাঁ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেই আপনাকে ধিক্কার দিতাম। পুলিসে কাজ করিলে লোকের মনে ভীষণ সংশয় আশ্রয় করে। বাস্তবিকই আমরা পুলিসে কার্য্য করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হই বলিয়া লোকে আমাদের বিশ্বাস করে না। এইরূপ চিন্তার বোঝা চাপা দিয়া গফুর খাঁ সম্বন্ধে নীচ সন্দেহটুকু যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতাম।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহিণী কতকটা পরমান্ন খাইতে দিলেন। স্ত্রী মন্দ রাঁধিলেও আমি চিরদিন তাঁহার রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতাম। অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, এরূপ কার্য্য প্রত্যেকেই করিয়া থাকেন। আজ কিন্তু পরমান্ন পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—আহা! পায়সটা যেন অমৃত হয়েছে, তোমার হাত খুব মিষ্টি।

স্ত্রী হাসিল—তৃপ্তির হাসি। সে বলিল,—খাঁটি দুধ না হ'লে এসব জিনিস ভাল হয় না। এ গফুর খাঁর দুধে তৈরি। সত্যি একটা কিছু কর। লোকটা রোজ আমাদের কিছু-না-কিছু দিচ্চে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ! এখনও তো দেড় মাস ছুটি আছে। যাবার সময় ডালি দিয়ে গেলেই হ'বে।

পরদিন প্রভাতে বায়ু সেবন করিতে যাইবার সময় দেখিলাম—মোটঘাট লইয়া অনেকগুলি পশ্চিমের লোক গফুর খাঁর বাটীতে আসিল। এরূপ লোক তাহার নিকট প্রায় আসিত! সে লোকগুলা কেন তাহার বাটীতে সপ্তাহে সপ্তাহে আসে তাহা জানিবার জন্য কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। গফুর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ লোকগুলি কে?

সে হাসিয়া বলিল—বাবু, ঠিক এক রকম ব্যবসায়ে চলে না। এরা মফঃস্বল থেকে ঘি নিয়ে আসে। আমি কলকাতার বাজারে সেই ঘি উঁচুদরে বিক্রী করি।

সেই দিন দশটার সময় খাঁ সাহেব কতকটা ঘৃত পাঠাইয়া দিল। অতি সুস্বাদু বিশুদ্ধ ঘৃত। বাস্তবিক আত্মগ্লানি হইল—পুলিসে কাজ করিয়া মনের মধ্যে মিথ্যা সন্দেহ পুষিয়া রাখিয়াছি।

—সন্দেহ—

সে দিন গফুর খাঁ ঘরে ছিল না। তাহার একটি ভৃত্য ছিল—লোকটা কোন্ জাতীয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, লোকটার মা ব্রহ্মদেশীয়া এবং পিতা হিন্দুস্থানী মুসলমান। তাহাকে সকলে নানকু বলিয়া ডাকিত।

নানকুর বয়স কুড়ি-বাইশ বছর, তাহার কাজের মধ্যে কেবল গফুর খাঁর পক্ষীগুলির পরিচর্য্যা করা। সেদিন বেলা তিন চারিটার সময় আমার পুত্র মহা আনন্দে গফুর খাঁর খাঁচায় করিয়া আমার গৃহে একটি শালিখ পাখী লইয়া আসিল। আমি বলিলাম—কে দিলে?

সে বলিল—নানকু।

আমি বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম, উঠানে দাঁড়াইয়া নানকু বিড়ি টানিতেছে। আমি অতি আগ্রহে পুত্রের হস্ত হইতে পিঞ্জরাটি গ্রহণ করিলাম। সে পিঁজরাগুলি টিনের—বলিয়াছি, তলায় খাবার দিবার একখানি টিন আছে তাহার তলায় অপর একখণ্ড টিন। তাহা না হইলে সেখানি টানিলে খাঁচার তলায় কিছু থাকিবে না। যে টিনখানি টানা যায় তাহার চারিদিকে কানা আছে, খাঁচাটির নীচের টিন হইতে কানার উপর অবধি প্রায় তিন ইঞ্চি উঁচু। কিন্তু টিনখানি টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলাম সেট মাত্র এক ইঞ্চি উঁচু। সেখানির এবং নীচের টিনের মধ্যে তাহা হইলে দুই ইঞ্চি ব্যবধান আছে। উপর হইতে দেখিলে কিছু বুঝিতে পারা যায় না। এই ব্যবধানটুকু আরও দৃষ্টিগোচার হয় না, কারণ খাঁচার তলায় শুকানো ঘাস দেওয়া থাকে। বোধ হয় পাখীদের গরম রাখিবার জন্য। খাঁচাগুলি প্রায় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দেড় ফুট করিয়া।

পুলিসের মন। আবার কেমন কু-ভাব আসিল, খাচাগুলার তলায় ১৷৷০ ফুট্ × ১৷৷০ ফুট্ × ২ ইঞ্চি একটি কামরা থাকে কেন?

এমন সময় নানকু ডাকিল—বাবু!

আমি বাহিরে গিয়া বলিলাম—কি নানকু?

সে বলিল—খোকাবাবু কান্‌ছিল বলে পিঁজরা দিয়েছি। ওপিঁজরা দেবার মিঞার হুকুম নেই।

আমি বলিলাম—ওঃ! আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্চি।

সে বলিল—খোকাবাবু রোয়ে তো জরুরি নেই।

আমি বলিলাম—না, ও কাঁদবে না।

আমার সহিত কথা কহিবার সময় নানকু বিড়ি নামাইয়াছিল! সে আবার নির্ভাবনায় বিড়ি টানিতে লাগিল। আমি খোকাকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার পিঁজরাটি প্রত্যর্পণ করিলাম।

তাহার পরদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম—

"অদ্ভুত বাতাবী—কাল লালবাজার পুলিসকোর্টে একটি বড় নূতন রকমের মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এজেহারে প্রকাশ যে, কাষ্টম্‌স্ ইন্‌স্পেক্টার বুগ্‌লু গত শুক্রবার দিবস উট্রাম ঘাটের জেটিতে পাহারা দিবার সময় দেখিতে পায় যে একটি চীনা হাতে একটি বাতাবী লেবু লইয়া মোটঘাট সহ রেঙ্গুন মেল জাহাজে আরোহণ করিতে যাইতেছে। তাহার হাবভাব সন্দেহজনক দেখিয়া বুগ্‌লু সাহেব তাহাকে পণ্টুনের উপর দাঁড় করাইয়া তাহার আসবাবপত্র তল্লাসী করেন। খানাতল্লাসীর ফলে কোন প্রকার পদার্থ না পাইয়া সাহেব রসিকতা করিয়া তাহার বাতাবী লেবুটি ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অবশ্য চীনবাসী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তখন কাষ্টম্‌সের গোমেস সাহেব আসিয়া রঙ্গরসে যোগদান করে। সে চীনার হস্ত হইতে বাতাবী লেবুটি কাড়িয়া লইয়া বুগ্‌লুর দিকে নিক্ষেপ করে। বুগ্‌লু সেটি লুফিয়া বড় আশ্চর্য্য বোধ করিল—বাতাবী লেবুটি কাঠের ভাঁটার মত ভারী। মিঃ বুগ্‌লু ও মিঃ

গোমেস তখন বাতাবী লেবুটি কাটিয়া দেখে তাহার ভিতর হইতে সমস্ত শাঁস বাহির করিয়া তাহার ভিতর আফিম ভর্ত্তি করা হইয়াছে। পার্শ্বে এক পয়সার আকারের একটু খোসা কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত শাঁস বাহির করিয়া তাহা অহিফেন পূর্ণ করা হইয়াছিল। পরে ভাল আঠা দ্বারা সেই রন্ধ্র বন্ধ করা হইয়াছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইন্‌হোর বিচারে চীনবাসীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।”

সংবাদটি পড়িয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই একমুখ হাসি লইয়া গৃহে আমার পুত্র প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে নানা প্রকার বিলাতী খেলনা। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, গফুর মিঞা কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল। খোকার জন্য উপঢৌকন আনিয়াছে। অপুত্রক গফুর খাঁ আমার পুত্রকে স্নেহ করিত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি বাস্তবিক বড় অপদস্থ হইলাম।

—খানা-তল্লাস—

তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইতেছিলাম। গফুর খাঁ দুইজন চাটগেঁয়ে জাহাজী নাবিকের সহিত কথা কহিতেছিল। আমার কর্ণে তাহার শেষ কথাটা প্রবেশ করিল—আজ চারটা মাল যাবে।

আমি তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলাম—কি হ’চ্চে?

সে বলিল—আজ মাল পাঠাব তার বন্দোবস্ত করছি। এঁরা

জাহাজের লস্কর। এঁদের হাত দিয়ে মাল পাঠালে ভাড়া লাগে না। এঁদেরও লাভ হয় আর আমারও ফায়দা হয়।

আমি চলিয়া গেলাম। মনের মধ্যে তুমুল ঝড় উঠিল। কি করা কর্ত্তব্য! আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে গফুর খাঁ পাখী পাঠাইবার ভাণ করিয়া খাঁচার তলায় আফিম ভর্ত্তি করিয়া চালান দেয়। প্রকাশ্যভাবে না পাঠাইয়া জাহাজের লস্করদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ বিচিত্র পিঁজরাগুলার সাহায্যে অবৈধ আফিমের কার্য্য করিয়া লোকটা ধনবান হইয়াছিল। সে বিষয়টি মনের মধ্যে যতই আন্দোলন করিতে লাগিলাম আমার সন্দেহটা যেন ততই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ঐরূপ আকৃতির পিঁজরার সাহায্যে সে যে অবৈধ ব্যবসা করে তাহা নিঃসন্দেহ। বাতাবী লেবুর মোকদ্দমার কথা পড়িয়া মনে আফিমের কথা উঠিয়াছিল। চীনা বন্ধু—বিদেশ হইতে ঘৃত লইয়া প্রতি সপ্তাহে লোকের আমদানী—চালানী খাঁচা অপর কাহাকেও দিবার হুকুম নাই—এমন কি খোকাকেও নয়। লোকটা আমার শিশুকে অত ভালবাসে কিন্তু তাহাকেও একটা চালানী খাঁচা—

আর ভাবিতে পারিলাম না। ট্রাম গাড়ীতে বসিয়া মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া বাহিরে দেখিলাম। শত শত নরনারী মনের সুখে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে আর আমি একাকী মনের মধ্যে কুচিন্তা পুষিয়া একটা ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছি। আমার পুত্রের উপর তাহার নিঃস্বার্থ স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণটা আরও দমিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা!

আবার কর্ত্তব্যের কথা ভাবিলাম—সরকারের অন্নে আমি পরিপুষ্ট,

দুষ্টের দমনের জন্য আমার নিয়োগ। সমাজের লোক বলিয়াও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। অহিফেনের ব্যবসা ত এক প্রকার বিষের ব্যবসা। আমি এ সংবাদ জানিয়া স্থির হইয়া থাকিলে আমার পক্ষে অধর্ম্ম করা হইবে। কিন্তু শিশু—

আমার পুত্র আমার কর্ত্তব্যের পথ বড় বিষমভাবে রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমি গফুর খাঁর পক্ষে তর্ক করিতে লাগিলাম। আমার কর্ত্তব্য আমার এলাকার ভিতর, এখানে কর্ত্তব্য-ভার কলিকাতা পুলিসের উপর ন্যস্ত। সমাজের পাপ পুণ্যের ভার ভগবানের হস্তে, আমার ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি থাকিতে পারে? বাস্তবিক লোকটার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। আবার পুলিশের সুর—মন বলিল—বাপু, নিজের লাভের জন্য কর্ত্তব্য হানি করিলে? আবার তর্ক করিয়া স্থির করিলাম যে বাস্তবিক আমি লোকটাকে ধরাইবার চেষ্টা করিতেছি—আত্মোন্নতির জন্য, পুরস্কারের লোভে, পদোন্নতির লোভে। সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য প্রভৃতি বড় বড় কথা। বাসনার মূলে বেশ স্পষ্ট উজ্জ্বল্য ভাবে অবস্থিত—লোভ।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে ট্রামগাড়ি হইতে নামিতে হইল মুচিপাড়ার থানার সম্মুখে। আমাকে লইয়া একটা মহা টানাটানি চলিতে লাগিল। থানার ভিতর যাইব না বাসায় ফিরিব? কর্ত্তব্য ও শিশু—পদোন্নতি ও শিষ্টাচার —মহা আন্দোলন, মহাদ্বন্দ্ব। পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিলাম ইনস্পেক্টর।

তিনি আমায় অভিবাদন করিলেন। আমার আর কতদিন ছুটি বাকি আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—বল্‌ছিলাম কি? এই গফুর খাঁ—আমার প্রতিবেশী গফুর খাঁ—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ গফুর খাঁ। চিনি গফুর খাঁকে—লোকে তাকে বলে চিড়িয়া গফুর। তারপর কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে এই বেহালা অবধি গিয়েছিলাম। তা আপনাদের থানার কাজ কর্ম্ম কেমন? কোকেন কেস টেস, এই ওর নাম কি আফিম কেস—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ আফিম কোকেনের ছোট কেস পাই। আসল কর্ত্তাদের তো ধরতে পারি না।

আমার হৃদপিণ্ড নৃত্য করিতেছিল। আমার হাতের ভিতর একটা মস্ত বড় আসল কর্ত্তা রহিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিতে পারিলাম না। যতই কথার অবতারণা করিতে গেলাম, কথাটা পাকচক্রে কেমন ঘুর্ণীর মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আমি আর একবার মনের দুর্ব্বলতাটাকে দমন করিয়া বলিলাম—অনেক আফিম বর্ম্মায়, চীনদেশে চালান হ'য়ে যায়, অথচ—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ তাও জানি? কিন্তু ধরা যে বড় মুস্কিল।

তাঁহার কথা শেষ না হইতে একটা কুলির মাথায় গফুর খাঁর চারিটা খাঁচা লইয়া তাহার একজন ভৃত্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া আমাদের সম্মুখে বৌবাজার ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল! বুঝিলাম তাহার কথামত গফুর খাঁ চারটি মাল চালান দিতেছে। আর ভাবিবার সময় ছিল না, তর্ক করিবার অবসর ছিল না, পুত্রের মুখের ভাবনা আসিতে পারিল না। তখন জীবনের পুলিস-বৃত্তি জাগিয়া উঠিল, কর্ত্তব্যের কথা মনে হইল। আমি ইনসপেক্টরকে বলিলাম—এই যে চারটে খাঁচা যাচ্চে তল্লাস করুন দেখি, নিশ্চয় আফিম পাবেন।

এই কথাটা বলিবার সময় আমার কি রকম মুখের ভাব হইয়াছিল জানি না। কলিকাতার পুলিস ইনস্পেক্টার বাবু বলিলেন—আপনার কি অসুখ করছে? একটু জল খাবেন?

আমি বলিলাম—না মশায় নষ্ট করবেন না, শীঘ্র ধরুন, শীঘ্র ধরুন। নিশ্চয় আফিম আছে। টানাটা টানলেই দেখবেন নীচের ডহরে আফিম। আমার নাম করবেন না। বুঝলেন?

ইনসপেক্টর ছুটিয়া গিয়া কুলিটিকে ধরিল। ভীষণ উত্তেজনায় আমার হস্তপদ কাঁপিতেছিল। ইনস্পেক্টর বাবু তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গফুর খাঁর সেই ভৃত্যটি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইনস্পেক্টর বাবু প্রথমে একটি খাঁচা লইয়া সেই টিনের টানাটি টানিলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি উৎসুক নয়নে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। আফিমের কোন চিহ্ন নাই। দ্বিতীয় খাঁচাটি ইনস্পেক্টর বাবু তল্লাস করিলেন—সমান ফল। তৃতীয়, চতুর্থ কিছু নাই।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। গফুর খাঁর লোকটি আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। সকলেই নির্ব্বাক। শেষে গফুর খাঁর লোকই কথা কহিল। সে বলিল—কি মশায়?

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন—এ খাঁচা গুলি বেশ ভাল, তাই দেখছিলাম। আমার এমনি খাঁচা চাই।

লোকটা হাসিয়া বলিল—হুকুম করলেই হয়। আজই মিঞাকে বলব এখন। এগুলা চালান যাচ্চে, না হলে হুজুরের কাছে দিয়ে যেতাম।

তিনি বলিলেন—না আমার দরকার হলে চেয়ে পাঠাব।

লোকটা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ইন্‌সপেক্টর বাবু একটু ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—কাজটা একটু নোঙরা হল। আপনার মাথায় এ খেয়াল গেল কেন? গফুর খাঁ ও সব কাজ করলে আমাদের কানে খবর আসত না?

আমি বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম। একটু চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। স্ত্রী বলিল—আজ তোমার বড় বেশী মেহনত হ'য়েছে—এত বেশী বেড়ালে আবার অসুখ করতে পারে। তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হচ্চে।

পরদিন প্রভাতে গফুর খাঁ আমায় ধরিল। সেলাম করিয়া বলিল—বাবু ছুটি ক'দিন আছে?

আমি বলিলাম—আর দিন কুড়ি পঁচিশ হবে।

সে বলিল—গোলামের একটা সল্লা শুনুন। ছুটি রদ্ করে কাজে ফিরুন।

আমি বলিলাম—কেন?

সে বলিল—আমাদের একটা বদ্ স্বভাব আছে, যে আমাদের কাজে হাত দেয় তার ছেলেকে কেটে ফেলি।

তাহার মুখে সেই সৌজন্যের ভাব।

সে বলিল—এই ধরুন পশ্চিম থেকে আমার আফিম আসে। এই আফিম জাহাজে চালান করি, বর্ম্মার ভিতর দিয়ে চীন মুল্লুকে যায়। এক সের আফিম বেচলে চাল্লিশ পঞ্চাশ টাকা লাভ হয়। বুঝলেন দারোগা বাবু?

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুনিতেছিলাম। তাহা হইলে সে জানিত আমি দারোগো, বোধ হয় আমার ভৃত্যের নিকট সংবাদ লইয়াছিল।

সে বলিল—পাড়াগেঁয়ে দারোগা এসব কাজতো বোঝেন না। আফিম আমরা অন্য ঠাই রাখি। এখান থেকে খাঁচা চালান হয়, সেখানে আফিল ভর্ত্তি হ'য়ে জাহাজে যায়। যদি ধরা পড়ে, যে লোকটার দখলে আফিম পাওয়া যায়, তার জেল হ'বে। আইন আমায় ছুঁতে পারে না। বুঝলেন ?

আমার বিশ্বাস, আমি খুব নির্ব্বোধের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম।

সে বলিল—দেখুন বাবু, আপনার ছেলেটিকে আমি পেয়ার করি। কিন্তু আমাদের মত লোকের কোন দিল্ নেই। জরুরি বোধ করলে সব করতে পারি। এই কোরাণের কসম করে বলছি, যদি আর আমাদের সঙ্গে চালাকি করেন, আপনার ছেলেকে টুকরো করে কাটব, আপনাকে—আপনার জরুকে—

লোকটার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। আমার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার শেষ কথাগুলা শুনিতে পাইলাম না। আমি ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে না গিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে গেলাম। সেই দিনই প্রথম ট্রেণে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইলাম। গাড়িতে উঠিবার সময় গফুর খাঁ আমার পুত্রকে কতকগুলা খেলনা দিয়া আমায় বলিল—সেলাম।

উঃ! তাহার তিনটি অক্ষরে কি তীব্র বিষ মাখানো ছিল!

এখন জানি গফুর খাঁ ব্যবসায়ী মিঃ নির্ম্মলকান্ত রায়ের এজেন্ট ছিল।

সমাপ্ত